মাদাম হালিদা এদিবের জীবন-স্মৃতি

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, বি-এল, প্রণীত

বি, সিংহ এণ্ড কোং
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩৪৩ সাল

প্রকাশক—
শ্রীললিত মোহন সিংহ
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৭৩এ শম্ভুচাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি,এল, এম এল সি,
এড্ভোকেট মহাশয়

নরেনদা

একদিন একবন্ধুকে বলছিলাম—নরেনদাদার স্বদেশ-সেবা নির্ভীক—তার দেশ-ভক্তি সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতি-পূর্ণ। তুমি শুন্‌তে পেয়ে বলেছিলে—সত্যি নাকি? লিখে দে।

তাই সে কথা লিখে দিলাম এ পত্রে। আর আমার অভিমত যে আন্তরিক তার নিদর্শন-স্বরূপ তোমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার দিলাম এই ক্ষুদ্র পুস্তক। একজন মহা-প্রাণ স্বদেশ-সেবিকার জীবন-স্মৃতির এ সামান্য পরিচয়।

তোমার দেশ-সেবা সফল হক্।

পুলিশকোর্ট
৩১ মার্চ্চ ৩৬

স্নেহের
কেশব।

—বিবৃতি—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে কোথা হতে আসে সমুদ্রে হয় হারা।"

এ রহস্য কেবল ভারতবর্ষের জন-সমুদ্রে বিদ্যমান নয়। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস এক একটা জন-স্রোতের অভ্যুত্থান-পতনের কাহিনী। উর, চালদিয়া, আসিরিয়া, ব্যাবীলন, মিসর, ফিনিসিয়া, কার্থেজ প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন সেমিটিক জাতির সম্পদ ও গৌরবকে গ্রাস করিয়াছিল উত্তর-পশ্চিম হইতে অভ্যাগত আর্য্যজাতি। উত্তর আফ্রিকা—আর্য্য-রোমক বিজয়ীদের লীলাভূমি হইয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার মীদ্ ও পারসিক আর্য্য-সভ্যতা সেমিটিকদের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। তারপর আর্য্য-গ্রীক আর্য্য-রোমক ঐ প্রদেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া সেমিটিক জাতি নিজের বিশিষ্টতা বা কৃষ্টি হারায় নাই। মুসা প্রভৃতি পয়গম্বর যে য়িহুদি জাতির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই সেমিটিক য়িহুদীর গৃহে প্রেমের অবতার, সহিষ্ণুতা ও শান্তির প্রতীক প্রভু যীশু বিশ্ব প্রীতির বার্ত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে তাঁর প্রভাব অসীম।

এই সেমিটিক জাতির অপর শাখা সহরে ও মরুভূমে পৃথক জীবনযাপন করিতেছিল। মক্কা মোদিনার কোরেশ ছিল—

সুমার্জ্জিত, জ্ঞানী, ভাব-প্রবণ। কবিতা ছিল তার অন্তরের সাধনা। তার জ্ঞাতি-ভ্রাতা বেদু মরুভূমির মাঝে অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা, দুর্ব্বার সাহস আর বীরতার অপব্যবহার করিতেছিল—গৃহ বিবাদে। সভ্যতা-গর্ব্বিত সহরবাসীর কাছে সে ছিল অনাদৃত, অবজ্ঞাত। অনেক মার্জ্জিত আরব ছিল পৌত্তলিক, অনেকে ছিল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

খ্রীষ্টীয় সপ্তশতকে এদের মাঝে অবতীর্ণ হইলেন পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ। দীনতা ও বীরতাকে তিনি সমৃদ্ধ করিলেন। প্রগাঢ় আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মানব প্রাণকে শুদ্ধ করিলেন। জগতের ইতিহাসের দিক্ থেকে সে সাম্যভাব অতি-মহান—সেই ভাবের প্রেরণায় হজরত স্বজাতিকে অনুপ্রাণিত করিলেন। সহজ সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার। কোঁরেশ ও বেদু সমভাবে সে সত্য উপলব্ধি করিল। ইসলাম—আল্লার সাম্রাজ্য পয়গম্বর তাঁর নায়েব মাত্র। সুতরাং হজরত ও তাঁর খলিফা-উত্তরাধিকারীরা—দীনভাবে দিন কাটাইয়া সিকি শতকের অনতি-দীর্ঘ কালে সমগ্র পশ্চিম এসিয়া ইশলাম-রাজ্যে পরিণত করিলেন। একশত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সারাসেন বা আরব সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকার কুলে কুলে প্রচারিত হইয়া আট্লান্টিক সাগর অবধি অগ্রসর হইল। ভূমধ্য-সাগর পার হইয়া শেষে সে সাম্রাজ্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল দক্ষিণ-স্পেনে। রোমক ঈগল আরব শক্তির তাড়নায় আসিয়া আফ্রিকা হইতে উড়িয়া রোমে এবং কুস্তন-তুনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমার মনে হয় ইশলামের এই অভিযান ও সাফল্যের

মূলে নিহিত ছিল এক মূলমন্ত্র—মানুষের অবজ্ঞাত অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি। যারা শক্তিমান ছিল—সাধারণ মানুষ—তাদের শক্তিকে, তথা-কথিত সুমার্জ্জিত মানব-প্রকৃতি অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত, আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। হজরত ও তাঁর স্থলবর্ত্তী প্রথম খলিফাগণ কার্য্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" খোদার চক্ষে সবাই সমান। সেই মুক্ত শক্তির আত্মজ্ঞান হইবা মাত্র সে তারুণ্যের কল্পনা ও ক্ষমতায় নিজেকে প্রবল করিয়াছিল। খৃষ্টীয়, য়িহুদী, পৌত্তলিক, মেষ-পালক, উষ্ট্র-চালক—কবি ও অধিনায়কের সমকক্ষতা লাভ করিয়া ইশলামের পতাকা দেশদেশান্তরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে একদিন শাক্য-মুনি ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের একাধিপত্য ম্লান করিয়া বৌদ্ধযুগ অগণিত অব্রাহ্মণ জ্ঞানী, শিল্পী ও বীরের কীর্ত্তি কাহিনী জগতের দেশদেশান্তরে খোদিত করিয়াছিল।

কিন্তু মানুষের ব্যষ্টি বা সমষ্টির শক্তি মলিন হয় অতি-সাফল্যের দীপ্তির প্রতিক্রিয়ায়। আব্বাসিদ্ ভূপতিরা বিলাস ব্যসনে সারাসেন সাম্রাজ্যে ধ্বংশের বীজ বপন করিল। হারুণ-অল-রসিদের সুমেরু-স্পর্শ-সমৃদ্ধির অন্তরে লুক্কায়িত ছিল পতনের কৃষ্ণছায়া।

এই সেমিটিক জাতিকে পরাস্ত করিল পূর্ব্বদিক হ'তে আগত এক মানব জাতির দুর্ব্বার স্রোত। মধ্য-এশিয়ার সানুদেশে তাতার ভ্রমণকারীর দল বহুদিন এক অদম্য প্রেরণা অনুভব করিতেছিল বিশ্ব-বিজয়ের। তারা চীন, মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া

বিজয় করিয়া গৃহস্থালী শিখিয়াছিল। তারা ঐ সব প্রদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি নিজস্ব করিয়া তাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নিজেদের নবীন বীরত্বে ঐ সকল জাতি প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।

তাতার জাতির একদল য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপ এবং বিশেষ হাঙ্গারীতে বাস করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এদেরই আত্মীয়েরা দক্ষিণ রুশিয়ায় কাজাকরূপে বীরতার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল।

মুসলমান বোগ্দাদী সাম্রাজ্য যখন গৃহ-কলহে বিব্রত, সিংহাসনের লোভ যখন ভ্রাতৃ-হন্তারক, স্বজাতি-দ্রোহী, প্রাচ্যের তাতার স্রোত তখন নবীন শক্তি ও সংগঠনের মদির-উষ্ণ। জেঙ্গিস খাঁ এসিয়ার মুসলমান রাজ্য করায়ত্ত করিল—রক্তস্রোত সহর, জাঙ্গাল, মরুভূমি রঞ্জিত করিল।

পরে এই তাতার জাতির বহুশাখা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের শক্তিতে মুসলমান-শক্তি আবার নবীন জীবনের সাড়া পাইয়াছিল। কিন্তু আর মুসলমানের এক সাম্রাজ্য বিদ্যমান রহিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য, মিসর, মরক্কো প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

তাতার জাতির একদল ভ্রাম্যমান অসিজীবি গজনীতে রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতে অভিযান করিয়াছিল। পরে এই জাতিরই অন্য-শাখা বাবরের নেতৃত্বে ভারতে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিল।

ভাষা ও ভাবের সমতা অধ্যয়ন করিয়া বিগত শতকের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেমন প্রকাণ্ড আর্য্য জাতির সম্প্রসারণের

ইতিহাস উপলব্ধি করিয়াছে—গত সিকি শতকে তেমনি এই বিস্তৃত তাতার জাতির জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বিস্তারের কাহিনী পণ্ডিতদের মুগ্ধ করিয়াছে। ল্যাপল্যাণ্ডে সুইড জাতি ল্যাপদের নিজস্ব করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে। আন্ত-জাতিক বিবাহ সুইড্ ভাষা-খৃষ্টীয় স্কন্ধনাভ শাসন অনুশাসন সত্ত্বেও যে সব বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় ল্যাপেদের মাঝে—তাহাতে তাদের তাতার রক্তের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হাঙ্গেরীর ম্যাগীর, লিথুয়েনিয়ার য়িহুদী ধর্ম্মী তাতার প্রভৃতির তুর্কীর জ্ঞাতিত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তুর্কীতে যে তাতারবংশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল সে বংশের নাম ওস্‌মান্ বা অথমান বংশ। এই রাজবংশ কিরূপে সারাসেন রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

বহুদিন হইতে আনাতোলিয়ায় একদল তাতার বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা ভ্রমণ-কারীর জীবন ত্যাগ করিয়াছিল। ক্ষাত্র-ধর্ম্ম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে এরা যাপন করিত। কাজেই গ্রীক, মুসলমান সকলেই সুবিধামত ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিত রণক্ষেত্রে। এই সেলজুক তুর্কদের দলপতি, সদলবলে প্রথমে খৃষ্টীয় পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমীর হইয়াছিল। সারাসেন জাতির অধঃপতনের সময় তারা একপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। গ্রীক ও পারস্যের জমি দখল করিয়া এরা ক্রমশঃ নিজেদের রাজত্ব বাড়াইতেছিল।

ওস্‌মানের পিতা আরতোঘুল আর একদল তুর্কীর নেতা। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে তার দল আসিয়া সেলজুকদের সঙ্গে

যোগদান করিল। ওসমান আমীর হইল। সে এক মুসলমান সেকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসললান সাম্রাজ্যে নিজের স্বজাতির সাহায্য দান করিল। আরব, গ্রীক বারবার জাতি বিক্রম হারাইয়াছিল। তুর্কী জাতি বীরত্ব, সৌর্য্য, ভদ্রতা ও ক্ষত্রিয়গুণে খিলাফতের অধ্যক্ষ হইয়াছিল। আবার মোস্লেম-শক্তি পুনরুদ্দিপিত হইল।

আরবদের স্থল অধিকার করিল তুর্ক। দ্বিতীয় মোহাদের রাজত্ব কালে তারা কন্‌স্টান্টিনোপল জয় করিল। তার পূর্ব্বেই অনেক বলকান ও গ্রীক প্রদেশ তাদের করায়ত্ত হইয়াছিল।

তাদের সাম্রাজ্যের প্রথমভাগে তুর্কী য়ুরোপের শক্তিদের বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। কিন্তু পতন অভ্যুত্থন বন্ধুর পথে তুর্কী হইল অধঃপতিত—য়ুরোপের নবীন রাষ্ট গুলি হইতে লাগিল ক্রম-বর্দ্ধমান। সপ্তদশ শতাব্দীতে তুর্কীর কোনো প্রভাব রহিল না জগতের ইতিহাসে।

ক্রমশঃ এক এক করিয়া খৃষ্টীয় প্রদেশ তুর্কীর হস্তচ্যুত হইতে লাগিল।

আধুনিক ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা বলকান যুদ্ধ। সর্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতি ধীরে ধীরে তুর্কীর বিলায়ত বা য়ুরোপীয় প্রদেশ গ্রাস করিল। ট্রিপলী দখল করিল ইতালী। মিশরও তুর্কীর শাসনের বাহিরে গেল।

মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে তুর্কী সাম্রাজ্য য়ুরোপে মাত্র কুস্তনতুনিয়ায় আবদ্ধ ছিল। ইংরাজের মিত্রতার ফলে তুর্কী রুষিয়ার কবল হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কিন্তু মহাসমরে জার্ম্মান পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুর্কী মিত্রশক্তির

শত্রুতা বরণ করিল। তুর্কীর জন-শক্তি জাতীয়তাবাদ অবলম্বন করিয়া অত্যাচারী ভূপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল। কিন্তু বহুদিনের অরাজকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে দেশ-হিতৈষিরা গৃহ বিবাদে লিপ্ত হইল।

তুর্কীর নূতন শত্রু ইংরাজ আরবদের সাহায্য করিয়া তাদের স্বাধীন করিল। সিরিয়া মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি সমস্ত এখন তুর্কী সাম্রাজ্যের বাহিরে।

কিন্তু তুর্কী-জাতির শক্তি ও সংগঠন ক্ষমতা অসাধারণ। তাদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র করিবার জন্য—তুর্কী দেশ-সেবকেরা ব্যস্ত।

গত বৎসর মাদাম হালিদা এদিব যখন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তাহার বিশ্ব-বিশ্রুত-গ্রন্থ Memoiers of alida Edib অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "দেশ" পত্রিকায় কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই পুস্তকে সেগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট। পরিশিষ্ট মাদামের ভারতবর্ষে দেওয়া কতকগুলি বক্তৃতার সারাংশ।

নবীন তুর্কীগণতন্ত্র অভিব্যক্তির ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। অতীতকালেসহ-ধর্ম্মী একত্র মিশিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিত। সে রাষ্ট্রে বিভিন্নজাতি বহু-ভাষা, অনেক পরস্পর-বিরোধী ঐতিহ্য অনাদরে অভিমানে গুম্‌রিয়া সুপ্ত থাকিত —যে দল প্রবল তার গৌরবকে নিজস্ব করা ভিন্ন প্রজার উপায় থাকিত না। তরুণ তুর্কীর ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে—বিশেষ ভূখণ্ডে একত্র বাস এবং এক ভাষাই পাশ্চাত্যের আদর্শে জাতীয়তাবাদ পোষণ করিতে পারে। বহু-শতাব্দী এক রাষ্ট্রে

বাস করিয়াও আরব মুসলমান ও তুর্কী, কুর্দ্দী প্রভৃতি মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদের কুহক-মন্ত্রে তুরাণী ঐতিহ্য, ভাষা এবং জ্ঞাতিত্বকে কেন্দ্র করিয়া তুর্কীর জাতীয়তা অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং আরবও আপনাকে বিজয়ী তুরাণীর শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আরব জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টীয় ও মুসলমান আরব সম্প্রদায় এক দেশে বাস করে, এক ভাষা বলে এবং এক জাতীয়তার দাবী করে। নবীন ইরাকে তারা আরব জাতি হিসাবে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়াছে। কুর্দ্দীজাতি নিজের সাতন্ত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিধিমতে সচেষ্ট। ইরাণ এই আদর্শে আপনাকে সু-নিয়ন্ত্রিত করিয়া সিয়া-শুন্নীর বিরোধ লুপ্ত করিয়াছে।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ্য-বন্ধের প্রাচীন আদর্শ এবং তরুণ-প্রাচ্যে প্রবুদ্ধ নবীন জাতীয়তার প্রেরণার মাঝে তুর্কী আর এখন দোটানার স্রোতে অনিশ্চিত কিংকর্ত্তব্য মনোবৃত্তি লইয়া দেশ সেবায় ব্রত নয়। সে সুনিশ্চিতভাবে আধুনিকতা এবং জাতীয়তাবাদের স্রোতে নৌকা ভাসাইয়াছে।

এসিয়ার একপ্রান্তে জাপান অন্যপ্রান্তে তুর্কী সমগ্র প্রাচ্যের প্রেরণার উৎস। নবীন তুর্কীর ইতিহাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকের।

ঘটনা পঞ্জী। শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

৬১০ খৃঃ অঃ ইসলাম প্রথম প্রচার।
৬১২ ,, ,, হিজিরা।
৬২৮ ,, ,, ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্ম্মাণ।

৬৩০ ,, ,, মক্কা বিজয়—ইসলামের বিস্তৃতি।

৬৩২ ,, ,, হজরতের মৃত্যু, আবুবাকর খলিফ।

৬৩৪ ,, ,, আবুবাকরের মৃত্যু, ওমরের খিলাফত।

৬৩৫ ,, ,, দামাস্কাস বিজয়।

৬৩৭ ,, ,, কদেসিয়ার যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়। পারস্যের অনেক অংশ এবং জেরুজিলাম আলেপো প্রভৃতি বিজয়।

৬৫৮ ,, ,, মিশর বিজয়।

৬৬১ ,, ,, দামাস্কসে রাজধানী।

৬৮০ ,, ,, কারবালা—হোসেন হত্যা।

৬৯৭ ,, ,, কার্থেজ বিজয়। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ কূল হইতে রোমান সাম্রাজ্য বিলুপ্ত।

৭৫০ ,, ,, আব্বাসায়েদ বংশের শাসন আরম্ভ।

৭৬২ ,, ,, বগদাদে রাজধানী স্থাপন।

৭৮৬-৮০৯ খৃঃ অঃ হারুণ-অল রসিদের রাজত্ব কাল।

১২১৮-১২২১ খৃঃ অঃ জেঙ্গিজ খাঁর বিজয়।

১২৫৮ খৃঃ অঃ আবতোঘ্রুলের পুত্র ওসমানের জন্ম। হুলাগু তাতার কর্ত্তৃক বোগদাদ বিজয় এবং আব্বাসায়াদ বংশের লোপ।

১৩০১ ,, ,, ওসমান অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন এবং খোদাতাব পাঠ।

১৩৩৬ ,, ,, জানি জেরি সেনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

১৩৮৯ ,, ,, মুরাদ সারভিয়া বসনিয়া হাঙ্গারি আলবেনিয়া এবং ওয়ালেসিয়া সৈন্যকে পরাজিত করেন।

১৩৮৯ ,, ,, জনৈক সরভিয়ান সেনা কর্ত্তৃক মুরাদের হত্যা।

১৪৫৩ ,, ,, দ্বিতীয় মহম্মদ কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল বিজয়।

১৪৫৭ ,, ,, ক্রিমিয়া বিজয়

১৫১৬ ,, ,, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন বিজয়।

১৫১৩ ,, ,, সলিম কর্ত্তৃক মিসর বিজয় এবং খলিফ্ উপাধি গ্রহণ।

১৫২১ ,, ,, বেলগ্রেড্ বিজয়।

১৫২৫ ,, ,, হাঙ্গারিবিজয় ॥

১৫৭০ ,, ,, আরব বিজয়, মক্কায় সুলতানের জুম্মা প্রার্থনা।

১৫৭৪ ,, ,, টিউনিস্ বিজয়।

১৬৩৮ ,, ,, চতুর্থ মুরাদ কর্ত্তৃক বাগ্দাদ দখল।

১৬৪০ ,, ,, ক্রীট দখল।

১৬৮২ ,, ,, ২য় সোলেমানের সময় অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক বেলগ্রেড্ দখল।

১৭৭১ ,, ,, রুশিয়া কর্ত্তৃক ক্রীমিয়া দখল।

১৮৭৭ ,, ,, শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৮ ,, ,, আব্দুল হামিদ কর্ত্তৃক শাসন পরিষদ মূলতবি ও তুর্কী অনেক য়ুরোপীয় প্রদেশ হারাইল।

১৮৯৪ ,, ,, আরমানি হত্যা।

১৮৯৬ ,, ,, দ্বিতীয় আরমাণী হত্যা।

১৮৯৯ ,, ,, জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বাগ্দাদ রেল করিবার ক্ষমতা লাভ।

১৯০৪ ,, ,, আরমানি হত্যা।

১৯১১ ,, ,, ত্রিপলীর যুদ্ধ।

১৯১২ ,, ,, বলকানি যুদ্ধ।

১৯১৪ ,, ,, মহাসমর।

১৯১৯-২০ ,, ভার্মাই সন্ধি।

১৯২০ ,, তুর্কী কর্ত্তৃক খিলাফত বর্জ্জন এবং আরব ত্যাগ।

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
বিবৃতি			৴০
ঘটনা পঞ্জী			॥০ পৃষ্ঠা
পরীর ভয়	...	...	২
সুতিকা গৃহ	...	...	৫
ক্রীতদাস	...	...	৫
শ্রেণী ভেদ	...	...	৬
দোকানদার	...	...	৬
আরবী বনাম তুর্কী	...	...	৭
কৈফিয়ৎ	...	...	৭
নিজের কথা	...	...	৮
জননী	...	...	৮
সৎপিতা	...	...	৯
তালাক	...	...	১০
পিতা	...	...	১১
পিতা ও সৎপিতার সখ্য	...	...	১২
পাত্রী নির্ব্বাচন	...	...	১৫
ছায়া বাজী	...	...	১৭
কারা গুজ	...	...	১৮
পুতুল নাচ	...	...	২১

বিষয়			পত্রাঙ্ক
তুর্কী নাট্যশালা	...	...	২২
আশলী করম	...	...	২৫
স্বামী বিবেকানন্দ	...	...	২৮
পরিণয়	...	...	৩০
পরিণীত জীবন	...	...	৩১
মাতৃত্ব	...	...	৩৪
শিশু পালন	...	...	৩৫
শিশুর নাম করণ	...	...	৩৬
কুস্বপ্ন	...	...	৩৭
স্বপ্ন ফল	...	...	৩৮
স্বপ্ন রহস্য	...	...	৩৯
টোগো	...	...	৪০
তুর্কী ভাষা	...	...	৪১
সেক্সপিয়ার	...	...	৪২
খৃষ্ট ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম	...	...	৪৩
পয়গম্বর	...	...	৪৩
সাম্প্রদায়িকতা	...	...	৪৫
বুদ্ধদেব	...	...	৪৬
পুলিশের তাড়া	...	...	৪৬
তালাক	...	...	৪৮
শালাহ্ জাকি-বে	...	...	৪৯
প্রাচীন তুরস্ক	...	...	৫০
জানি-জারী	...	...	৫৩

বিষয়			পত্রাঙ্ক
দ্বিতীয় মাহামুদ	...	...	৫৪
আবদুল মজিদ	...	...	৫৫
রসিদ পাশা	...	...	৫৬
অত্যাচার	...	...	৫৬
জীর্ণ সংস্কার	...	...	৫৮
রেড ক্লিপ	...	...	৫৯
আবদুল আজিজ	...	...	৬০
পঞ্চম মুরাদ	...	...	৬১
হাবদুল হামিদ	...	...	৬২
শাসন পরিষদ	...	...	৬৩
স্বল্পায়ু পরিষদ	...	...	৬৩
মিদ্ধত পাশা	...	...	৬৩
দমন নীতি	...	...	৬৫
বিপ্লব	...	...	৬৬
উল্লাস	...	...	৬৭
সংবাদপত্র	...	...	৬৯
গৃহ বিবাদ	...	...	৭০
ভলকান	...	...	৭১
রক্তপাত	...	...	৭১
আরমানী হত্যা	...	...	৭২
মাদামের পলায়ন	...	...	৭৪
মিশরে মাদাম	...	...	৭৫
গৃহ-বিবাদের ফল	...	...	৭৬

বিষয়			পত্রাঙ্ক
টিপলী	...	...	৭৭
পঞ্চম মহাম্মদ	...	...	৭৮
বল্কান যুদ্ধ	...	...	৭৮
মহাসমর	...	...	৭৯
আরব ও তুরস্ক	...	...	৮১
জার্ম্মাণ প্রভাব	...	...	৮৩
সংগঠন	...	...	৮৫
অজ্ঞ শিশু	...	...	৮৬
শিক্ষা	...	...	৯০
মাদ্রাসা	...	...	৯০
দেশের সাড়া	...	...	৯১
মহাযুদ্ধের কালে	...	...	৯২
আরবী বিরোধ	...	...	৯২
উপসংহার	...	...	৯৩

পরিশিষ্ট মাদামের ভারতবর্ষের বক্তৃতাবলি

ঐ (ক)	...	...	৯৭
ঐ (খ)	...	...	৯৯
ঐ (গ)	...	...	১০১
ঐ (ঘ)	...	...	১০২



মাদম হালিদা এবিদ যৌবনে

মাদাম হালিদা এদিবের

জীবন-স্মৃতি

বিদূষী হালিদা এদিবের জীবন-স্মৃতি বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তুর্কীজাতির অর্দ্ধ শতকের ইতিহাস সমকালের দেশপ্রাণ লেখিকার তুলিকাসম্পাতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন-স্মৃতির ভাষা স্পষ্ট, আধুনিক ইংরাজী। তার বর্ণনা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

বিদেশী লেখকের কলমে ইতিহাস একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হয়। কারণ লেখক তার জাতীয় আদর্শের মানদণ্ডে বিদেশের ঘটনাকে যাচাই করে। দেশের লেখককে স্বদেশের জীবন-সংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাতে নিত্য সাড়া দিতে হয়। তাই জাতীয়তার অভিব্যক্তি-সংগ্রাম বর্ণিতে পারে যে উত্তমরূপে। আমরা ইংরাজ লেখকের মুখে নব্য তুর্কীর অভ্যুদয়ের কথা শুনি। সে বর্ণনায় শ্লেষ আছে, গুরুগিরির ভর্ৎসনা আছে। মাদাম হালিদা এদিবের বর্ণনায় প্রাণ আছে, ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি আছে। মুস্তাফা কামাল পাশার সহিত তাঁর বিরোধ, তবু নবীন তুর্কীর বিরোধী নন তিনি—হইতে পারেন না কস্মিনকালে। এক

বিরাট অভিমানের সুরে স্বদেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করিয়া তিনি তাঁর অমূল্য গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

লেখিকার শৈশবে—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—নানা প্রকার কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল তুর্কী। এখন তাহারা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এ বিশ্বাস অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজও বিশ্বাস করিত পরী-জিন-দৈত্য-দানবের প্রভাব। রোজা—তুর্কী ভাষায় হোজা—তুর্কী সমাজে চিকিৎসকের প্রাপ্য শ্রদ্ধা লাভ করিত।

পরীর ভয়

মাদামের নিজের নামকরণ হইয়াছিল—এক পীরের সমাধি-অঙ্গনে মানতের ফলে। পীরের নাম ছিল হালিদ্। লেখিকার পিতা হালিদের তুরবায় (দরগায়) পুত্র লাভের বর চাহিয়াছিলেন। পীর হালিদ্ কুস্তনতুনিয়া-বিজয়ের এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাইজানসীয় সম্রাটের দেশে অভিযান করিয়াছিলেন। তাই শহরের বাহিরে আয়ূব বা হালিদ পীরের সমাধি তুর্কী জাতির নিকট পবিত্র। যখন লেখিকা জন্মগ্রহণ করেন, পুত্রলাভ না করিয়া কন্যা পাইয়া তাঁর পরিজন মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তবু পীরের প্রসাদে কন্যার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁর নামকরণ হইয়াছিল হালিদা।

পরীর আবেশে লোকে পীড়িত হয়—এ বিশ্বাস ছিল সার্ব্বজনীন। হালিদার পিতামহীর বংশ-কৌলিন্যের গর্ব্ব ছিল। তবু তাঁর সংসারে পরীর হোজা আর্জা হানুম নামক এক মহিলা বড় সম্মানিত হইতেন। কুমারী হালিদা তরুণ-বয়সে অসুস্থ হইলে

হকিম আসিত না, হোজ্জা আসিত। সে মন্ত্র পড়িয়া, পরীর সঙ্গে তর্ক করিয়া, তাহাকে ভয় দেখাইয়া, উৎকোচ দিয়া, আবিষ্ট নর-নারীর রোগ প্রশমন করিত। মোরগ, দুম্বা, সোনাদানার প্রলোভন না দেখাইলে ভূতের কবল হইতে কেহ নিষ্কৃতি লাভ করিত না।

আর্জা হানুমের খুব পশার ছিল। তার বাড়ীর বাহিরে বাগানে সার দিয়া ধনী-নির্ধন নর-নারী প্রতীক্ষা করিত, তাহার দ্বারা রোগ পরীক্ষা করাইবার আশায়। আর্জাহানুমকে আর্ত্ত, ব্যথিত সবারই মর্ম্ম-পীড়ার কাহিনী শুনিতে হইত। দাম্পত্য কলহের আখ্যায়িকার খুঁটি-নাটি সকল সমাচার শুনিয়া বিরহীর শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইত। আর্জা হানুম নিজে ছিল শান্ত-স্বভাব। তাই তার পরামর্শে অনেক স্থলে কলহান্তরিতের বিবাহচ্ছেদ বন্ধ হইত।

আর্জা হানুমের এক সহায়ক পরী ছিল, তাহার নাম রুকুশ হানুম। পরী-রাজ্যে রুকুশের এক প্রণয়ী ছিল—সে সংবাদও আর্জা হানুমের অবিদিত ছিল না। তার নাম য়াভরু বে। রুকুশ ও য়াভরু বে'র সহায়তায় হোজা আর্জা হানুম ভাবীকালের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিত। তাদেরই সখ্যতার প্রসাদে সেরোগ প্রশমনের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল।

চিকিৎসা করিবার সময় হানুম জপমালা হাতে লইয়া এক অনুচ্চ আসনে বসিত। রূপার ধুনুচীতে লোবান, অম্বর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য জ্বলিত। ঘন ঘন মালা ঘুরাইয়া হোজা-মহিলা ঘরের

ছাদের একস্থলে দৃষ্টি রাখিয়া পরীর সঙ্গে বাদানুবাদ করিত, চুক্তি করিত।

—কেন এমন করছ বাছা? ছিঃ! ভাল পরী তুমি, এমন ক'রে ছেলেটির ঘাড়ে চাপতে হয়! ছিঃ! ছিঃ! ছাড়। অমনি ছাড়বে না? কিছু ভেট চাই? তা দেব। তবে কি জান, ওর বাপের এখন অবস্থা মন্দ। বাজার খারাপ। আচ্ছা, একটা মোরগ পাবে। হবে না? আচ্ছা, একটা দুম্বা, না আর হবে না।—

এই রকম কথোপকথন চলিত পরীর সঙ্গে হোজার। মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরব থাকিত দর্শক। যে পরী একগুয়ে সে উপঢৌকনের প্রলোভনেও রোগীর ঘাড় হইতে নামিতে চাহিত না। তাকে ভয় দেখাইত আর্জা হানুম,—

—ওঃ! ছাড়বে না? আচ্ছা দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। রুকুশ তাড়াও ত একে। ওঃ! রুকুশকে ভয় কর না? য়াভরু বে, দাও তো এর ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে।—

বলা বাহুল্য, তারপর পরী রোগীকে মুক্তি দিত। নিজের কল্যাণকামী হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত রণে।

এই উপ-দেবতার মিত্র বালিকা হালিদার মনে ভীতি সঞ্চার করিত। তার বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষকে মনে হইত ভূতের বাসা। তার প্রাঙ্গণের মেষের গায়ে হেনার রঙ মাখানো থাকিত। পরীরা মেদীর রঙ ভয় করে। পরীরা সেকালের সকল লোককে সন্ত্রাসিত করিত। সূতিকা-গৃহে পরীর অত্যাচার

নিরোধ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত তাহার বর্ণনা দিয়াছেন লেখিকা।

সূতিকা-গৃহ

প্রসূতিকে সূতিকা-গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয় প্রাচ্যে সকল দেশে। তুর্কীতে শিশু ও জননী চল্লিশ দিন আতুরঘরে থাকে। এদেশে যেমন পাঁচু ঠাকুরের ভয়, ওদেশেও তেমনি পরীর ভয়। সূতিকা-গৃহে একজন প্রহরী সর্ব্বদাই থাকে। দরিদ্রের ঘরে পাড়ার কোনও সহৃদয় বর্ষীয়সী আসিয়া জননীকে আতুরঘরে শিশুপালনে সহায়তা করে। কারণ, একেলা পাইলে দুষ্ট পরীর দল শিশুকে অভিভূত করে।

পরীর ভয়ে তুরস্কে সূতিকা-গৃহের বাহিরে দরজার পাশে সর্ব্বদা এক গাছা ঝাঁটা রাখা হয়। সময় মত সম্মার্জ্জনীর সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে জীন বা পরী শিশুকে ছাড়িয়া দেয়। প্রসূতীর বালিসের নীচে সর্ব্বদা থাকে একখণ্ড কোরাণ। ধূপ ধূনা সূতিকা-গৃহকে পুণ্য গন্ধে ভরিয়া রাখে। প্রসূতীর কেশে বাঁধা থাকে এক টুকরা লাল ফিতা।

ক্রীত-দাস

শ্রীমতী হালিদা এদিবের শৈশব স্মৃতি পাঠ করিলে বুঝা যায়, ক্রীতদাসপ্রথা কত দূর প্রচলিত ছিল তুর্কীদের মধ্যে। সুন্দরী কারকেসিয় তরুণী ক্রীতদাসীরূপে বিরাজ করিত ধনী-গৃহে। বালিকা হালিদার এক কারকেসিয় বাঁদী ছিল। হাব্‌সী বাঁদী প্রত্যেকের ঘরেই গৃহকার্য্য করিত। তবে সে সব বাঁদী আমাদের

দেশের দাসীদের মত গৃহস্থের পরিবারের মহিলা বলিয়াই গণ্য হইত। প্রায়ই তাহাদের বিবাহ দিয়া মুক্ত দিত ধনীজনেরা। কত প্রভু নিজেই সুন্দরী বাঁদীকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া বাঁদীর বাঁদা হইত। স্তন্য-দান করিয়া যে সব পরিচারিকা শিশুদের পালন করিত, তাহাদের পালিত সন্তান আজীবনতাহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে পরিতৃপ্ত করিত।

শ্রেণী-ভেদ

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ নাই সত্য। কিন্তু মানবসমাজের সনাতন রীতি অনুসারে তুর্কীতে শ্রেণীভেদ যথেষ্ট ছিল—নব্যতুর্কীদের বিপ্লবের পূর্ব্বে। মাদাম হালিদা এদিবের পিতামহীর কৌলিন্য তাঁর পিতামহের বংশ কৌলিন্য অপেক্ষা অধিক ছিল। সে কথা পিতামহী সকলকে শুনাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। একবার কিশোরী হালিদা এক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। যখন তরুণদের জলযোগের ব্যবস্থা হইল তখন হালিদার পরিচারিকা তাঁহাকে সাধারণ লোকের পুত্র কন্যাদের সহিত একত্র পানাহার করিতে দিল না। মাদাম একথা তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখিতে বিস্মৃত হন নাই।

দোকানদার

ইস্তাম্বুলের বাজারে তুর্কী সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশের লোকের দোকান ছিল। বড়-ছোট সকল ব্যবসায় গ্রীক ও আর্ম্মানীদের হাতে ছিল। দোকানদারী করিত মুসলমান। আরব

হেনা ও কাজল বেচিত এবং নিজের পণ্য দ্রব্যকে অধিক মুল্যে বিক্রয় করিবার জন্য বলিত—সেগুলি পবিত্র মক্কা সহর হইতে আমদানী।

আরবী বনাম তুর্কী

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিত হইত। কামাল পাশার আধুনিক সংস্কারের বহুপূর্ব্ব হইতে আরবী ভাষার বিরুদ্ধে অভিযানের যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মাদামের শৈশবে তুর্কীভাষায় লিখিত পুস্তক অতি অল্প ছিল। আর তখনকার চলতি ভাষা হইতে পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত পৃথক ছিল। আরবী ভাষার প্রচলন ছিল অত্যধিক। জাতীয়তাবাদীরা সেকালেই উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জাতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলে জাতীয়তার অভিব্যক্তি অসম্ভব। শ্রীমতী হালিদা এদিব এ সত্য কৈশোরেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই যে সব দেশভক্ত তুর্কী নরনারী তুর্কী ভাষার নবীনরূপ দিয়াছেন মাদাম তাঁহাদের অন্যতম।

কৈফিয়ৎ

নবীন তুর্কীর অভ্যুদয়ের পূর্ণ ইতিহাস জীবন-স্মৃতিতে পাওয়া যায়। যে সকল বিষয়ে তুর্কীজাতির উপর সভ্যজগৎ বিদ্বেষ-পরবশ, সেই সব কথার তুর্কীপক্ষের সাফাই শুনিতে পাই জীবন-স্মৃতিতে। আর্ম্মাণী হত্যা, মহাসমরে জার্ম্মাণী পক্ষ সমর্থন, যুদ্ধের বন্দীদের উপর তথাকথিত অত্যাচার কাহিনী নূতন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে জীবন-স্মৃতিতে। যাহাদের বিশ্বাস, তুর্কী নররাক্ষসের

দেশ, তাহাদের ভ্রান্ত মতের আমুল পরিবর্ত্তন সম্ভব এই পুস্তক পাঠে।

নিজের কথা

জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠা বংশগৌরবের বিজয়-বৈজয়ন্তী নয়—এ ধারণা সাহিত্য-জগতে বিরল। অপ্রিয় সত্য প্রায়ই প্রচ্ছন্ন রাখে আপনাকে কীর্ত্তি-কাহিনীর মর্ম্মর-সৌধে—বিশেষ স্ব-রচিত জীবন-চরিতে। মাদাম হালিদার সাহিত্য-সাধনা অসাধারণ। সত্যের প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য—তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের ভাবনায় তিনি পথভ্রান্ত নন। কারণ, তাঁর আপনার জীবনের ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বিশ্বমানবকে শুনাইতে চাহিয়াছেন তাঁর সমকালের তুরস্কের অন্তর-ব্যথা—স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিপুল কঠোরতা। লেখিকা জীবনস্মৃতিতে তাঁর আত্মীয়-কুটুম্বের অবতারণা করিয়াছেন বস্তুতন্ত্রতার সহায়তায় সমাজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিবার প্রয়াসে।

জননী

তাঁর জননীর অবরোধ জীবনের কাহিনী বড় মর্ম্মস্পর্শী। তাঁর জীবনের ধারা সে-কালের সম্ভ্রান্ত সংসারের অনেক নারী-জীবনের স্রোতের অনুরূপ। সে চিত্র কেবল তুর্কী-মহিলার নয়—প্রাচ্য মহিলার। সে কাহিনীর মাঝে দলিত-প্রেমের মূর্চ্ছনা আছে—উচ্ছৃঙ্খল তরুণের পরিতাপের ঝঙ্কার আছে—আর আছে দরদী-প্রণয়ীর গভীর উদারতা।

তখন তুর্কী জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা সুলতান আবদুল হামিদ।

কুর্দ্দের সামন্ত বাদীরহান পাশা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিল। সরকারী ফৌজ তাহাকে পরাজিত করিয়া সপরিবারে ইস্তাম্বুলে আনিয়াছিল। কুর্দ্দীস্তানে বাদীরহানের প্রভাব ছিল বিশাল—সে পরাজিত শত্রুর পক্ষে সাম্যনীতিই প্রশস্ত। সহরতলীর এক কোণায় (বাগান বাড়ীতে) সম্ভ্রান্ত অতিথির মত বাস করিতে বাদীরহান আদিষ্ট হইল। তার কুর্দ্দীস্তানের ভূসম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করিলেন—তার পরিবর্ত্তে সামন্তের পরিবারস্থ সবার তঙ্খার বন্দোবস্ত হইল—কতগুলি পুত্র তুর্কীসৈন্য নায়ক-অধিনায়কের পদ প্রাপ্ত হইল। বাদীরহানের বেগম ছিল দশটি আর পুত্র কন্যা চল্লিশটি।

আলী শামল বাদীরহান পাশার কনিষ্ঠ পুত্র। আবদুল হামিদের ফৌজে সে লেপ্টেনাণ্টের পদ পাইয়াছিল। আলী সুপুরুষ—কিন্তু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল। তার বীরত্বের যশোগানে ইস্তাম্বুল মুখরিত হইল। মাদাম হালিদার পিতামহ আলী এফেণ্ডীর অভিলাষ হইল এই বলিষ্ঠ বীর তরুণকে গৃহ-জামাতা করিবেন।

সৎ-পিতা

যে বিবাহের সর্ত্ত উদ্বাহের পর জামাতা শ্বশুরগৃহে বাস করিবে—সে বন্ধনকে তুর্কী ভাষায় বলে ইচ্ছাররিয়া অলমক। সম্ভ্রান্ত আনাতোলিয়া বংশের এফেণ্ডিসুতাকে বধূরূপে পাইল আলী শামল—গৃহ-জামাতারূপে শ্বশুর-গৃহে বিরাজ করিবার প্রতিশ্রুতিতে। আলী এফেণ্ডীর এই কন্যা মাদাম হালিদা এদিবের জননী—আলী শামল মাদামের সৎ-পিতা।

বিবাহের পর আলী শামল শ্বশুর-গৃহে আদরের ঘর-জামাই। সকল বিলাসিতার অবাধ স্রোতে ভাসিয়া চলিল নূতন জামাতা। নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইল তাহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য। তার আত্মীয়-বন্ধু, বিশেষ ভাইয়ের দল, তাহার প্রমোদের সহচর। অপ্রতিহত আনন্দের উৎসবে আলী এফেণ্ডীর চির-শান্ত গৃহ গণ্ডগোলের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিশেষত্ব হারাইল। পান-ভোজন, নৃত্য-গীতের মজলিসে পরিণত হইল এফেণ্ডীর শেলামলিক বা বহির্ব্বাটী। সহচরদের সঙ্গে জামাতা গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান বীথিকায় বন্দুকের লক্ষ্য-ভেদ-প্রতিযোগিতায় পাখী মারিতে আরম্ভ করিল। একদিন শামলের মদির-উন্মত্ত মস্তিষ্কে খেয়াল হইল পিস্তলের গুলীতে ঘরের ছাদ-ভেদ করিবে। এ শুভ সঙ্কল্পে উৎসাহ দিবার বন্ধুর অভাব ছিলনা। পিস্তলের গুলী ছাদ ফুঁড়িয়াই ক্ষান্ত হইল না। "উপরের কক্ষে শায়িত এক কুটুম্বিনীর পায়ে লাগিল।

তালাক

নীরবে এই সব ব্যভিচার তিন চারি বৎসর সহ্য করিয়া মাদামের পিতামহ-পিতামহী ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। তাঁহারা কুর্দ্দী যুবকের নিকট নিজেদের কন্যার তালাক প্রার্থনা করিলেন। গর্ব্বিত আলী বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হইল। তার সুন্দরী স্ত্রীর কেহ মতামত গ্রহণ করিল না। তাঁর শান্ত জননীর জীবনের এই প্রথম অঙ্ক অবসানের কাতরতা লেখিকা বড় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন।—"আমি তাঁকে

কল্পনা করিতে পারি—তাঁহার মধুর আঁখিতে চাহিয়া তিনি তাঁহার জনক-জননীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন।”

হালিদা-জননীর প্রথম উদ্বাহের একটি ফল ছিল—শিশু-কন্যা মহমুরা। মহমুরা মাতার নিকট রহিল।

পিতা

হালিদার পিতা রাজপ্রাসাদের কর্ম্মচারী ছিলেন। শামলের তালাকের পর যুবক এদিব বে আলী এফেণ্ডীর গৃহে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। যুবক এদিব শিশু মহমুরাকে লইয়া কর্ম্মান্তে ক্রীড়া করিত—শিশুর সরল সঙ্গ তাহার শ্রান্ত হৃদয়ে প্রবাসবাসের কঠোরতা দূর করিত। ক্রমশঃ শিশুপ্রীতি পরিণত হইল তাহার জননীর প্রতি প্রণয়ে। গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া বাক্যালাপ করিয়া উভয়েরই প্রাণে উন্মাদনা আসিল। যুবতীর পিতামাতা তাহাদের হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ের সমাচার পাইয়া উদ্বাহ-বন্ধনে উভয়কে বাঁধিলেন। সে বিবাহও হইল পূর্ব্বের সর্ত্তে—এদিব বে শ্বশুরগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল হালিদা এদিব।

সমাজের মানুষ-গড়া অনুশাসন পরিণয় বন্ধন কাটিতে পারে কিন্তু সে প্রেমের মূল উপাড়িতে পারে না দেবতা-গড়া মনের অন্তস্তল হতে। মাদাম জননীর প্রথম প্রণয়ী আলি শামলের চিত্র তাঁর হৃদয়ে চিরদিন বিরাজিত ছিল। আলি শামল ও তার সুন্দরী পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কোনদিন ভুলিতে পারে নাই।

হালিদা জননীর উভয় পক্ষের স্বামীর বিদেশে মিলনের ইতিহাস বড় রোমান্টিক।

এই সময় মক্কা হইতে সংবাদ আসিল শরীফ আবদুল্লা স্থলতানের বিরুদ্ধতাচরণ করিতেছে। বিচারপতি লেবিব এফেণ্ডী রাজাজ্ঞা পাইলেন মক্কায় গিয়া শরীফ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিয়া তার পদে অন্য শরীফ নিযুক্ত করিতে। মাদাম হালিদার পিতা এবিদ বে এই কমিশনের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। আর ভাগ্যচক্রে লেবিব এফেণ্ডির এডিকঙ্‌ নিযুক্ত হইলেন আলী শামল।

পিতা ও সৎ-পিতার সখ্য

সেকালের স্থলতান ছিলেন সন্দিগ্ধমন। কাহারও উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। দূতের কার্য্যাবলী গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিবার গুপ্তচর ছিল। সাম্রাজ্য জুড়িয়া গোয়েন্দা পুলিশের এক বিশাল জাল ফেলা ছিল। কোনো রাজপুরুষকে বহুদিন অতিমাত্রায় সম্মান দান করিতেন না স্থলতান। রাজপ্রতিনিধিরূপে যাঁরা মক্কা প্রভৃতি স্থদূর প্রদেশে যাত্রা করিতেন, তাঁদেরও যাত্রা করিতে হইত সাধারণ যাত্রী-পোতে। রণতরী ছিল স্থলতান আবদুল হামিদের অনেক। কিন্তু তারা আবদ্ধ থাকিত স্থবর্ণশৃঙ্খলে—ভূমধ্যসাগর পার হইবার জন্য কোনও কর্ম্মচারী অনুমতি পাইতেন না সরকারী যুদ্ধ-জাহাজে চড়িবার। একে সজ্জিত রণপোত তার উপর সশস্ত্র রাজদূত—উচ্চাভিলাষ তো মানুষকে নিমেষে রাজদ্রোহী করিতে পারে।

কাজেই সামান্য যাত্রী-নৌকায় শঙ্কা-চকিত প্রাণে লেবিব এফেণ্ডীর দলবল আরব অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইল। সেই জল-যাত্রার পর উঠ-বাহনে তাদের মরুপথে চলিতে হইল পবিত্র তীর্থাভিমুখে। এ দুর্গম পথে সমবয়স্ক পথিকরা যদি সখ্যসূত্রে না আবদ্ধ হয় তো কোন দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া তরুণ হৃদয় মিশিতে পারে নবীন প্রাণের সাথে? আলী শামলের মন বীরত্বে ভরা—দুর্গম পথ তার প্রেয়। বুভুক্ষু বেদুইনের দল বালিয়াড়ীর অন্তরালে লুকাইয়া মাঝে মাঝে তাদের কারাভান আক্রমণ করিতে লাগিল। বেদুইন মানে মাত্র তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—সে সুলতানের আইনও মানে না, তাঁর রাজপুরুষেও বিশেষত্ব দেখে না।

পথশ্রান্ত পথিকেরা যখন মোক্কায় পৌছিল, তখন হজ-তীর্থের কাল। বিচারপতি লেবিব যথাযোগ্য আড়ম্বর করিয়া বাদ্-সাহের ফারমন পড়িয়া সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সম্মুখে শরীফের নিগ্রহ করিলেন।

এই অবসরে মক্কায় প্রাদুর্ভাব হইল বিসূচিকা মহামারীর। রাজপুরুষেরা কর্ম্ম অন্তে যথাসম্ভব আত্মরক্ষায় আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু কুর্দ্দী যুবক আলী শামল চিরদিন উচ্ছৃঙ্খল। তার পর প্রবাসী, তালাকের পর ভাঙ্গাহৃদয় লইয়া আসিয়াছিল মক্কায়। সাবধানতার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিবার মত শিক্ষা বা সাধনা তার ছিল না। সহরের সর্ব্বত্র সে আনন্দের

উৎসবে যোগদান করিল। ফলে, দুষ্ট কলেরা রোগে সে আক্রান্ত হইল।

অন্য কেহ তাহার শুশ্রূষা করিবার বীরত্ব প্রকাশ করিল না—রোগ সংক্রমণের ভয়ে সবাই শঙ্কিত। এদিব বে জানিত আলী শামল তার সহধর্ম্মিণীর প্রথম স্বামী। আলী শামল কিন্তু জানিত না যে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করিয়াছে এবং এদিব বে সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এদিব বে'র মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র ঈর্ষা ছিল না। সে নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধুর সেবা করিয়া তাহাকে অভিভূত করিল।

যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় আলী পরপারের বিভীষিকা দেখিল, তখন সে বন্ধু এদিবের নিকট নিস্ফল বিবাহের কাহিনী বিবৃত করিল। তাহাকে সুকুমারী শিশু মহমুরার কথা বলিল। তার নিজের ঘড়ি দিল এদিবের হাতে—আর দিল প্রবাসে যা' কিছু সম্পদ সাথে ছিল। তাহাকে অনুরোধ করিল এ সব তার পরিত্যক্তা প্রেয়সীর নিকট পৌঁছে দিতে। তার সঙ্গে পাঠাইল সে তার সন্তপ্ত প্রাণের আশীর্ব্বাদ।

এদিব আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। সে রহস্য ব্যক্ত করিল—মহমুরা যে তার নিজেরই কন্যার মত সে কথা ব্যক্ত করিল। সে প্রতিশ্রুত হইল—তার দেহে প্রাণ থাকিতে শামল-তনয়ার অযত্ন হইবে না। সে তার নিজের পরিচ্ছদে রোগীকে আচ্ছাদন করিল।

কিন্তু বিধাতার বিধানে এ-কাহিনী বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল না, কারণ সে যাত্রা আলী শামল রক্ষা পাইয়া গেল।

মক্কা হইতে ফিরিয়া মাদামের সৎ-পিতা আবার সেই উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে পড়িয়াছিল। পরে সে আরও কয়টি রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিল। এদিবের সহিত তাহার বন্ধুত্ব কোনদিন ম্লান হয় নাই। হালিদাকে তাহার মহমুরা আবলা (দিদি) চিরদিন স্নেহ করিত এবং এই দুই ভগ্নীর পরস্পরের ভালবাসার কথা জীবন-স্মৃতির অনেক পৃষ্ঠা দখল করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিণয়ের পর মাদামের জননী তাঁর প্রথম স্বামীকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁর কণ্ঠহারের বদ্ধ-লকেটে চিরদিন তাঁর চিত্র রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, যখন মাদামের পিতার দৃষ্টি পড়িল লকেটের চিত্রে, তাঁর উদার বিরহ-কাতর প্রাণ মোটেই বিক্ষুব্ধ হইল না।

আলী শামল বহুদিন সুলতানের কৃপা লাভ করিতে পারে নাই। রাজজ্যোতিষ আবদুল হুদাকে উৎপীড়ন করিয়াছিল বলিয়া সম্রাট তাহাকে দামাস্কাসে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল।

তুরস্কে মুস্তাফা কামাল অবরোধের পরদা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার পূর্ব্বে বিবাহের পাত্র তার ভাবী-

পাত্রী নির্ব্বাচন কালের জীবন-সঙ্গিনীর মুখ দেখিতে পাইত না—উদ্বাহের আগে। বলাবাহুল্য এ প্রথা প্রাচ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পাত্রীকে প্রথমে দেখে তুর্কীতে গুরুজ্ বা ঘটকিনী। তারপর পছন্দ করে, ছেলের আত্মীয় মহিলারা।

একাদশ বর্ষেই তখন তুর্কীর কিশোরীদের মুখ ঢাকিয়া রাজপথে বাহির হইতে হইত। মাদামের জ্যেষ্ঠা সহোদরা মহমুরা আব্লা (দিদি) কুর্দ্দী পিতার কন্যা। সে সমাজের অনু-শাসন মানিত—পথে বাহির হইবার সময়। কিন্তু তাদের পথের ধারের বাগানে দুষ্ট বালকের মত হুটাপাটি ছুটাছুটি করিত—বোরকা ফেলিয়া অবলীলাক্রমে সে গাছে উঠিত।

একদিন সে গাছের ডালে বসিয়া আছে—হালিদা প্রভৃতি সহচরীবৃন্দ তার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেছে, এমন সময় সমাচার আসিল—হারেমের ভিতর তাহাকে মহিলারা দেখিতে আসিয়াছে—বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া। সর্ব্বনাশ, অন্দর মহলে গুরুজু আর বহির্ব্বাটীর উদ্যানে বৃক্ষ শাখে বিবাহের পাত্রী! আর পাত্রীও আলী শামনের মত একগুঁয়ে উচ্ছৃঙ্খল—সে কোনো মতে নামিতে চাহে না। এর পূর্ব্বেই মাদামের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তার পিতামহী-প্রমুখ মহিলারা কিশোরীর সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, বখশিসের প্রলোভন দেখাইল—তবে মহমুরা নামিল।

বালিকার পোষাকে সাজাইয়া পাত্রী দেখান চলে না। কাজেই তার জননীর পুরাতন পরিচ্ছদে সে ভূষিতা হইল। সভাগৃহে পাত্রী-নির্ব্বাচন করিবার জন্য মহিলারা বসিয়াছিলেন। মাঝে ছিল এক সুসজ্জিত আসন। শোভাযাত্রা আসিল সভাগৃহে। প্রথমে এক ভৃত্য এক থালে কফির পেয়ালা বহিয়া আনিল। তারপর পাত্রী সকলকে যথারীতি ‘তশলীম আদাব’

করিয়া হাসিমুখে কুর্শীতে বসিল। তারপর প্রথা-মত প্রত্যেক মহিলা, পাত্র হইতে এক এক পেয়ালা কফি তুলিয়া লইলেন। এই কফির পেয়ালা ফেরত দিলেই বুঝিতে হইত—পাত্রী-পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, এবার সে কক্ষান্তরে যাইতে পারে। প্রথম দর্শনেই যে কন্যা অমনোনীত হইত, তার পরীক্ষা সভায় কফিপাত্র সত্বরেই প্রত্যর্পিত হইত। যার রূপগুণ বিচারসাপেক্ষ—তাকে বহুক্ষণ পরীক্ষা সভায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত—সোৎসুক দৃষ্টির কঠোরতা বরদাস্ত করিতে হইত।

বেশ প্রচ্ছন্ন রসিকতার সঙ্গে মাদাম তাঁর আল্লার পরীক্ষা সভার বর্ণনা দিয়াছেন। বোধ হয় তিনি এখনও সুসভ্য বাঙ্গালা দেশের এপ্রথার পরিচয় পান নাই। তথাকথিত নারী-প্রগতির যুগে কত শিক্ষিতা তরুণীকেও এই পাত্রী-নির্ব্বাচন পরীক্ষার ফলে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে হয়, তা যুগ-যুগান্তরের লাঞ্ছিতা ভারতমহিলার বিদ্রোহী অন্তরাত্মাই জানে।

ছায়া-বাজী নবীন বিজ্ঞানের সরস দান—সবাক্ ও নির্ব্বাক চিত্রে আনন্দলাভ করিবার বহুপূর্ব্বে মানব সমাজ তার ছায়া-জীবনের পরছায়ার খেলা দেখিয়া হর্ষ লাভ করিতে অভ্যস্ত ছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে কল্পনার অনুগামী, একথা স্বীকার করিয়াছেন অনেক বৈজ্ঞানিক। পাখীর মত স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়িবার কল্পনাকে বাস্তব করিয়াছে—বায়ু-পোত। নবীন পৃথিবীর

সকল ঐশ্বর্য্য; সকল সুখ, সকল বিলাস, ভোগেচ্ছারূপে বিরাজ করিয়াছে—অতীত সমাজের কামনাপ্রবণ হৃদয়ে।

তুরস্কে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইত, তার সাজ-সরঞ্জাম ও প্রক্রিয়া বিচিত্র। মেলার সময়ই সাধারণতঃ ময়দানে প্রদর্শনীর তাঁবু পড়িত। দর্শকেরা বসিত মাঠের বেঞ্চে। ধপধপে সাদা চাদরের পরদায় ছায়া নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু ম্যাজিক-লণ্ঠন তখনও তুর্কীতে প্রবেশলাভ করে নাই। উঠের পাতলা চামড়ায় পাত্র-পাত্রীর আকৃতি আঁকিয়া তাকে কাটা হইত। তার পিছনে মশালের উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে পরদার উপর ছায়া নিক্ষিপ্ত হইত। সেই উষ্ট্র-চর্ম্মের নরনারী বা পশুপক্ষীর গাত্রে বর্ণ-বিন্যাস করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদির বিধান করা হইত। স্থানে স্থানে ছিদ্র কাটিয়া প্রোজ্জ্বল মণি-মাণিক্য শুভ্র চাদরে প্রতিফলিত করিত, প্রাচীন তুরস্কের প্রদর্শকেরা। ছায়াচিত্রের দেহের গতির সঙ্গে যবনিকার অন্তরাল হইতে অভিনেতারা বক্তৃতা করিত। আমাদের দেশের পুতুল-নাচের খেলোয়াড়েরা পুতুলের নাচের তালে তালে এমনি গান করে—কেলুয়া, ভূলুয়া রূপী মেথরাণীর।

কারাগুজ

ছায়াবাজীর অভিনয়ের বিষয় ছিল. সাধারণতঃ কারাগুজের ভাঁড়ামি। তুরস্কের পল্লী-সাহিত্যে কারাগুজ ও তার কীর্ত্তিকথা ছিল বড় রমণীয়। যে রচয়িতা শ্লেষাত্মক রসিকতায় কোনো সমাজিক অনাচার বা শাসন পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতে

চাহিত তার বক্তব্য কারাগুজের মুখে বর্ণিত হইত। নবীন তুর্কী আর এখন কারাগুজের সে-কেলে ভোঁতা রসিকতায় তৃপ্তি পায় না, কিন্তু এখনও পল্লীর প্রবীণরা কারাগুজ কাহিনীর স্মৃতিতে উৎফুল্ল হয়। তার প্রচ্ছন্ন শ্লেষই ছিল তখনকার ধনী সমাজের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ।

কারাগুজ ছিল সুলতান প্রথম মুরাদের আমলের এক রাজমিস্ত্রী। হাজি এদিব নামক অন্য এক গৃহনির্ম্মাতার সঙ্গে সে সম্রাটের মস্‌জিদ নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। হাজি এদিব শ্রমিক হইয়াও নিজেকে আমির ভাবিত; সুতরাং উচ্চ-শ্রেণী-সুলভ দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার ছিল সে প্রতিমূর্ত্তি। তার মুখে ছিল কেবল উঁচু কথা। আর উচ্চের প্রসঙ্গে শ্লেষ প্রকাশ করিত কারাগুজ। এদের তর্ক-বিতর্কে সাধারণ শ্রমিকের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইত;—কারণ কারাগুজের সরল স্পষ্ট বচন তাদেরই গোপন-হৃদয়ে-মুখরিত সুরের প্রতিধ্বনি। সদাই শিল্পি-যুগলের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা হইত—একজন মহত্তের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিত; অপরে ছেঁদো কথায় তার আস্ফালনের অন্তঃসার-শূন্যতা প্রতিপন্ন করিত। বাক্‌যুদ্ধ ক্রমে মল্লযুদ্ধে পরিণত হইত। শ্রমিক ও শিল্পীর দল তখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়া তাদের কলহে যোগদান করিত। ফলে সুলতানের মসজিদ গড়ার কাজে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইল। অবশেষে ঐ কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি উভয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিলেন। রাজদণ্ড কারাগুজকে 'সহীদ' করিল। কারণ দুর্ব্বলের

দৌর্ব্বল্যকে যে প্রবলের সিংহাসনে বসাইত, তাহাকে তুর্কী ভুলিতে পারিত না। সুলতানের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপে নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অত্যাচার দেশের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইত। কারাগুজের সমাধির উপর দরিদ্র ভক্ত বাতি জ্বালিত, লোকের প্রাণের জ্বালাকে কথার ছন্দে গাঁথিয়া কবি, কারাগুজের উক্তিরূপে, সস্তার প্রদর্শনী ও নাট্যমঞ্চে প্রচার করিত। তুরস্কের পল্লী সাহিত্যে হাজী এদিব ও কারাগুজের কৌতুক-কাহিনী প্রবলের বিপক্ষে সাধারণ প্রজার প্রচ্ছন্ন অভিযান!

ছায়াবাজীতে তরুণী হালিদা কারাগুজের পালা দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিতেন। তার,তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে এরূপ প্রদর্শনী আরও মার্জ্জিত করিত, ভাবকে শুদ্ধ করিত। অভিনয়ে কারাগুজের মর্ম্মস্পর্শী ন্যাকামি ভাবপ্রবণ দর্শক মাত্রকেই ব্যতিব্যস্ত করিত। সে বেচারা, তাকে সবাই প্রহার করিত। বিশ্বের যত অত্যাচার, যত উৎপীড়ন মূর্ত্ত হইয়া পদে পদে তাকে বিপন্ন করিত। কিন্তু অভিনয়ের আকস্মিক বিপর্য্যয়ে প্রতি পদে সে বিপদ-মুক্ত হইত—অত্যাচারী হইত লজ্জিত। তার বিপদ-মুক্তিতে দর্শকের হর্ষোৎফুল্ল চীৎকারে মুখর হইত প্রেক্ষাগৃহ। তার নিজের পুত্র তাকে লাঞ্ছিত করিত। একবার একটা স্নান-ঘরের গম্বুজে উঠিল কারাগুজ—গামছা চুরি করিতে। তার বুদ্ধিমান পুত্র ছাদের সিঁড়ি সরাইয়া বলিল—'পয়সা দাও বাবা, তবে সিঁড়ি দেব—না দিলে গৃহস্বামীকে ডেকে দেব।' কি

করে বেচারা কারাগুজ,—নিজ তনয়কে উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা করিল।

মাদাম বলেন—ইহুদী দুনিয়ার সকলকে ভয় করে। কিন্তু কারাগুজের অভিনয়ে সেও কারাগুজকে প্রহার করে। এক অভিনয়ে কারাগুজ নাগর-দোলায় পাক দিতে ছিল। ইহুদী বলিল—'ঘোরাও'। সে যেমনি ঘুরাইল, ইহুদীর 'চাবুক' পড়িল তার পৃষ্ঠে। আবার ইহুদী যখন বলিল—থামাও, কারাগুজ বন্ধ করিয়া দিল দোদুল-দোলায় পাক। আবার ইহুদী তাকে প্রহার করিল; বলিল—'তুমি ইহুদীর ভাষা বোঝ না? ইহুদী ঘোরাও বল্‌লে থামাতে হয়, থামাও বল্লে—ঘোরাতে হয়।'

এ কথায় দর্শক খুব হাসে। কারণ তুরস্কে ইহুদী ঘৃণ্য। সেখানকার প্রবচন বলে, 'ইহুদী সব কাজ করে উল্টা।' কিন্তু এ বর্ণনায় মাদ্দামের সহানুভূতি-কাতর প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুতুলনাচ

পুতুলনাচও প্রচলিত ছিল—সেকালের তুরস্কে। বর্ণনা পড়িলে মনে হয়—সে নাচ আমাদের দেশের পুতুল নাচেরই অনুরূপ। তবে তুর্কীর পুতুলনাচের জন্ম বৈজয়ন্তীর আমলে। কারণ, পুতুল অভিনেতারা তুর্কী ও গ্রীক উভয় ভাষায় কথা কহিত আর প্রত্যেক অভিনয়ে পাত্ররূপে একজন গ্রীক পাদরী থাকিত; এবং একটা দৃশ্য থাকিত গ্রীক শব-যাত্রার।

তুর্কী নাট্যশালা

তুর্কী নাট্য-শালার অভিব্যক্তি আমাদের বাঙ্গালা নাট্য-শালার অনুরূপ। আমাদের দৃশ্য-পট, পাদ-দীপ, প্রেক্ষা-গৃহ প্রভৃতি এদেশী নয়। ইউরোপের অনুকরণে আমরা আধুনিক নাট্যশালা গড়িয়া তুলিয়াছি—গত সত্তর বৎসরের মধ্যে। ফ্রান্সের অনুকরণে তুর্কী নবীন রঙ্গমঞ্চ গঠিত করিয়াছে। তবে, আমাদের কৃষ্টির একটা প্রধান অঙ্গ—সংস্কৃত নাটক। কাজেই বাঙ্গালা-নাটক সংস্কৃত-রূপ ধারণ করিয়া পৌরাণিক গল্পকে এদেশের দর্শকের মুখরোচক করিয়াছে। ক্রমশঃ গিরিশ, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রভৃতির মনীষা তাকে বিচিত্র রূপ দিয়াছে। আজও নবীন নাট্যকারগণ যে নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা জগতের প্রত্যেক দেশের নাট্য-শালা ও নাট্য-সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

তুর্কী নাট্যশালার প্রথম বিকাশের সময় তুরস্কের লেখককে ফরাসীজাতির নিকট নাটকের আখ্যান-বস্তু ও কাব্য-কলা প্রকাশ্যভাবে ধার করিতে হইয়াছিল। মোলিয়ারের অফুরন্ত হাস্য-রস আর তাঁর নাটকের প্রেমিক-প্রেমিকা তুরস্কে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তুর্কীভাষা অবশ্য মূল ফরাসীর সকল রস আহরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু অনূদিত ফরাসী-নাটকই তুরস্কের নাট্যশালার প্রথম উদ্বোধনের কালে তুর্কী-দর্শককে মুগ্ধ করিত। আমার মনে হয়, তার প্রধান কারণ, মোলিয়ারের

অপূর্ব্ব সৃষ্টির মোহ। অবৈধ প্রেম ও প্রণয়ের মধুর বিচিত্রতা বিলাসোন্মাদ, অদিরসের কাঙ্গাল তুর্কী-জাতির নিভৃত বাসনার সুপ্ত তার, অতি দক্ষতার সহিত, ঝঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মাদাম হালিদা এদিব তাঁর প্রথম অভিনয় দেখার বর্ণনা দিয়াছেন,—জীবন-স্মৃতিতে। প্রেক্ষা-গৃহে দর্শকের বিরাট জনতা। মহিলাদের বসিবার স্থল জালী-পরদায় ঘেরা। যত রকম গন্ধ মানুষে কল্পনা করিতে পারে, মহিলা বিভাগ সেই সকল রকমের গন্ধে আমোদিত। সবাই ফল ও মিষ্টান্ন ভোজনে ব্যাপৃতা অভিনয়ের সময়—ফলের খোসা আর খাবারের টুকরার আবর্জ্জনায় প্রেক্ষা-গৃহ, পূর্ণ। মহিলাদের মধ্যে অবাধে সরবৎ বিক্রীত হইত—অভিনেতাদের বক্তৃতার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিত মহিলা-দর্শকের সরবৎ-ওয়ালীকে ডাকার চীৎকার!

সুলতান আবদুল হামিদের আমলে, জনপ্রিয় অভিনেতা ছিল—আবদুল রজক। লোকে আদর করিয়া তাহাকে আব্দী বলিয়া ডাকিত। রঙ্গমঞ্চে আব্দীর আবির্ভাব হইলেই বিপুল আনন্দধ্বনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিত। পথে ঘাটে সর্ব্বত্র আবদুল রজককে দেখিবার জন্য লোকে থাকিত লালায়িত।

রাজ-শক্তি যত দুর্ব্বল হয়, সে তত হয় সন্দিগ্ধ-মন। অত্যাচারী চাহেনা কোনো প্রজা সাধারণের হৃদয় অধিকার করে। এই সামান্য নটের জনপ্রিয়তা মহামহিম সম্রাট আবদুল হামিদের

বিষাক্ত প্রাণে জীঘাংসা উদ্বুদ্ধ করিল। জনমতকে পদ-দলিত করিবার মত সাহস ছিল না আবদুল হামিদের। সে জনপ্রিয় নাট্য-শিল্পীকে লোক-দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া গেল ছলনায়। এত বড় দক্ষ শিল্পীকে রাজ-সম্মান-বঞ্চিত করা কি রাজধর্ম্ম? কাজেই বাদসাহের খাস নাট্যশালায় সে অভিনেতা নিযুক্ত হইল। আবদুল হামিদের কৌশল বিফল হয় নাই। কারণ, ১৯০৮ সালের তুর্কীর রাষ্ট্রবিপ্লবের পর যখন আবদুল রজক সাধারণ নাট্যশালায় আবার অভিনয় করিতে আসিল, সে আর পুরাতন শ্রদ্ধা বা লুপ্ত-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। রাজ-অনুগ্রহে বেচারার শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের যেমন যাত্রার অভিনয়, তেমন অভিনয় তুরস্কের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রদর্শিত হইত বহুদিন। এ গীতাভিনয়কে তুর্কী-ভাষায় বলে ওরতাওয়ুন। কালের প্রভাবে এরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই দেশীয় অভিনয়েও মোলিয়ার প্রভৃতির পাত্র-পাত্রী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এখন আর খোলা-মাঠে ওরতাওয়ুন যাত্রা হয় না। ভাঙ্গা সস্তার কাঠের রঙ্গমঞ্চে এ শ্রেণীর অভিনয়, সাধারণ শ্রমিক প্রভৃতির আনন্দ বিধান করে।

'লয়লা-মজনু'র আদর প্রাচ্যের সর্ব্বত্র। সাধারণ নাট্যশালায় 'লয়লা-মজনু' তুর্কী-ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হইত। আর এক জনপ্রিয় নাটক ছিল—আশ্‌লী করম। এ গীতি-নাট্যের গল্পাংশ বড় মনোরম।

সাহজাদা করম ইস্পাহানের রাজপুত্র—সুপুরুষ, কবি। আশ্‌লীহান সহরের এক আরমানী-পাদ্রীর **আশলী করম** কন্যা। তার মধুর লাবণ্য রাজপুত্রকে উন্মত্ত করিল। তার প্রণয়কাহিনী সাহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি আরমানী-ধর্ম্মযাজকের নিকট পুত্রবধূরূপে তার সুন্দর-শ্রী কুমারীটিকে চাহিলেন। খ্রীষ্টীয় পুরোহিত, মুসলমান-সাহাজাদার সাথে কন্যার বিবাহ দিলে নিজের সমাজে হাস্যাস্পদ হইবে। অথচ রাজপুত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান না করিলেও রাজকোপের কঠোরতায় বিব্রত না হইবার উপায় নাই! দোটানার স্রোতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বেচারা প্রতিশ্রুত হইল—রাজপুত্রকে কন্যা সমর্পণ করিতে।

রাজার স্নেহের দুলালের উদ্বাহ। সহরে মহাধূম! বিরাট শোভাযাত্রা বর লইয়া সহর পরিভ্রমণ করিল। কিন্তু কবি বর—প্রকাণ্ড এক মিছিল লইয়া, রাশি রাশি বরযাত্রীর সঙ্গে, বহু-ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া কনের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। সকল সম্পন্ন-ব্যক্তির পুত্রের বিবাহের চিরাচরিত কার্য্যক্রম তো ঐ রকমই। কাজেই, ভাবীকালের জীবনসঙ্গিনীর গৃহ হইতে লোক-লস্কর বর-যাত্রীদের দূরে রাখিয়া হাতে বীন লইয়া কুমার করম শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিল।

আসল প্রেমের প্রবাহ কোন দিন তো অবাধে বহে না! বর দেখিল শূন্য গৃহ! মুসলমানের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবার ভয়ে খ্রীষ্টীয় পাদ্রী সপরিবারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে।

কি করে বিরহী?——সে তার আরাধ্যের প্রত্যেক দ্রব্য-সামগ্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বিরহ-সঙ্গীতে শূন্য-বিবাহ-বাসর মুখরিত করিল। কুমারী আশ্‌লীহান শিল্প-চতুরা। সে কাঠের ফ্রেমে জরির সূক্ষ্মকাজ করিত। সেই ফ্রেম উপলক্ষ করিয়া বিরহী রাজপুত্র গীত গাহিল। তার দীবান, তার সাড়ী, তার স্পর্শ-করা সকল পদার্থ, গায়কের অন্তস্তল নিঙ্‌ড়াইয়া সঙ্গীত বাহির করিতে লাগিল।

পিতা অনেক বুঝাইলেন, বন্ধু বান্ধব সবাই সদুপদেশ দিল—কিন্তু রাজকুমারের তরুণ-প্রাণের আগুন নিভিল না। সে উদাসী হইয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে পিতৃ-রাজ্য ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিল তার হৃদয়-প্রতিমা আশ্‌লীহান।

বিরহী প্রেমিকের সঙ্গীত মেঘকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে জানে কিনা আশ্‌লীহানের সন্ধান। সে শৈলরাজিকে প্রশ্ন করে—গিরিবর! তুমি কি দেখিয়াছ তাকে,—যার দাড়িম্বের মত গণ্ড?—ঝর্‌ণাকে সুধায়—তার প্রিয়ার বার্ত্তা। ঘাটে যেখানে ললনাকুল স্নানে রত, কবি সেথায় যায়—তাঁদের বলে—হ্যাঁ গা, তোমরা কি সন্ধান রাখ সেই রমণীরত্নের? বলাহক গাহিয়া বলে—রাজপুত্র আমি তো জানি না তার সন্ধান।

একবার প্রেমের দেবতা তার প্রতি সদয় হইলেন। এক সহরে সে সন্ধান পাইল যে, আশলীহানের জননী দাঁতের চিকিৎসা করিতেছেন। ছদ্মবেশী সেখানে গেল। তার দন্ত-

পীড়ার কথা বলিল চিকিৎসক-মহিলাকে। চিকিৎসক বলিল —দাঁত তুলিতে হইবে। যুবক তাহাতেই সম্মত হইল।

আশলীহানের জননী তরুণ-রোগীর মাথা রাখিল আশলী-হানের কোলে। সাঁড়াশী দিয়া তার একটা দাঁত উপাড়িল। কিন্তু তুচ্ছ দন্তের জন্য সেতো সে কোমল উপাধান ছাড়িতে পারেনা। সে বলিল—তার সমস্ত দশনপংক্তি দুষ্ট। চিকিৎসককে সে অনুরোধ করিল—সব কটা দাঁত উপাড়িয়া ফেলিতে। কিন্তু যখন গোটা কতক দাঁত তোলা হইয়াছে, তাহারা চিনিয়া ফেলিল রাজপুত্রকে। যেমন পরিচয়—অমনি পলায়ন। যন্ত্রপাতি ফেলিয়া মাতা ও কন্যা পলাইল।

আবার উদাস প্রাণে গান গাহিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে প্রান্তরে ঘুরিতে লাগিল—করম। শেষে আনাতোলিয়ার এক সহরে সে আরমানী পরিবারের সন্ধান পাইল।

সহর কোটাল করমের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইল। সহরের প্রধানেরা রাজপুত্রের প্রণয়কাহিনীর করুণ ছন্দে অভিভূত হইল। আরমানী পাদ্রীকে তাহারা বাধ্য করিল প্রতিশ্রুত হইতে, আশলী ও করমকে উদ্বাহের পবিত্র ডোরে বাঁধিতে।

মহাসমারোহের সঙ্গে সর্ব্বসমক্ষে করম ও আশলীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু আরমানীর মনের বিষ তো গেল না! সে বিবাহ পণ্ড করিবার ব্যবস্থা করিল তার যাদু-বিদ্যার বলে। যাদুকর আরমানী-পাদ্রী কন্যার এক বিচিত্র পোষাক প্রস্তুত করিল।

বাসর-শয্যায় রাজপুত্র যখন তার প্রিয়ার আল্‌খাল্লা খুলিতে চেষ্টা করিল, একটিও বোতাম খুলিল না। তার সব প্রচেষ্টা বিফল হইল, সকল শ্রম পণ্ড হইল। তখন তার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, নববধূর বিবাহ-বেশ যাদুকরের চাতুরীতে রচিত।

তার বীণাও তো ছিল সম্মোহন বিদ্যায় রচিত। সেই যাদু-বীণার সঙ্গীতে সে নববধূর বোতামের যাদু নষ্ট করিল। তার সম্মোহন-সঙ্গীতে গলার বোতাম খুলিল, তারপর আর একটি, তারপর অন্যটি। আনন্দে আপ্লুত হইল রাজপুত্র। কিন্তু যেমনি সে কুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অমনি একে একে বোতাম বন্ধ হয়! কি জঞ্জাল! সারা রাত এমনি আশায় নিরাশায় কাটিল। ক্রমে ঊষার রঙ্গীন্ আলোক রাঙিয়ে তুলিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষোভে যুবরাজ অধীর হইল। তার হৃদয়ের রুদ্ধ লালসা অগ্নিময়ী হইয়া তার মুখ-বিবর হইতে নির্গত হইতে লাগিল। নিজের মুখের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভাগ্যহীন প্রেমিক ভস্মীভূত হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তুরস্কে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন। পিয়ারে হায়াসিন্থ নামক এক ফরাসী ধর্ম্মযাজকও সেই বৎসর তুরস্কে নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে-ছিলেন। মাদাম তখন কলেজের ছাত্রী। বলা বাহুল্য, এই দুইজন প্রসিদ্ধ বাগ্মীর অভিভাষণ কুস্তনতুনিয়াতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কুমারী হালিদার মত জ্ঞানপিপাসা

যে তরুণীদের মধ্যে বিরাজমান, ভারতবর্ষের বিশ্ব-বিশ্রুত কৃতী বাগ্মীকে দেখিবার এবং তাঁর অভিভাষণ শুনিবার ব্যগ্রতা তাঁদের অন্তস্তল আলোড়িত করিবার কথা।

স্বামীজীর বাগ্মিতার খ্যাতি ছিল যে তাঁর ভাষা শ্রোতাদের পক্ষে "সম্মোহন মন্ত্র"। সুতরাং কলেজে আগ্রহের সঙ্গে হালিদা তাঁর অভিভাষণ শুনিলেন। হালিদার কাছে তিনি শ্যামবর্ণ (Dark) এবং কৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাঁর অনতিস্থূল বাহুর স্পন্দন দেখিয়া হালিদার মনে হইয়াছিল যেন তাঁর ভুজদ্বয় দেহ হইতে বিভিন্ন। তাঁর পরিস্ফুট অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং এশিয়ার রহস্যময় কুহক-বাণী শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিল।

স্বামীজীর শিল্পনিপুণ হাব-ভাব কুমারীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরের তারকে ঝঙ্কৃত করিতে পারেন নাই—বিবেকানন্দ। তাঁর তখন বিশ্বাস হইয়াছিল যে, পিয়ারে হায়াসিন্থের মত মর্ম্মস্পর্শ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ অক্ষম। স্বামীজীর বাগ্মিতায় কতকটা কৃত্রিমতা পরিলক্ষণ করিয়াছিলেন —যুবতী হালিদা।

আমার মনে হয়, এ ধারণার বিশেষ কারণ আছে। কুমারী হালিদার তখনকার সাধনা ও কৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয়। যতই সরল ভাষার কুহক-জাল নিক্ষেপ করুন স্বামীজী—তাঁহার পক্ষে বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য পাশ্চাত্যকে বুঝাইবার প্রচেষ্টা ছিল —বিশেষ শ্রমসাধ্য। তুর্কীর শিক্ষিত-সমাজ তখন ফরাসী

সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ অনুরক্ত। পিয়ারে হায়াসিন্থ ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। কাজেই তাঁর ভক্তি-মূলক প্রসঙ্গ নীরস বেদান্তের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাবপ্রবণ তারুণ্যের পক্ষে অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

পরিণয়

এই সময় হালিদা খানুম তুর্কীর বিচক্ষণ অধ্যাপক সালাহ্ জাকী-বের নিকট গণিত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জাকী-বে তাঁর পিতার বয়সের লোক। কিন্তু গণিত-শাস্ত্রে এমন পণ্ডিত সেকালে তুরস্ক সাম্রাজ্যে ছিল না। সে সময় তিনি তুর্কীর হাওয়া-ঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

জাকী-বে পাণ্ডিত্য-জগতকেই শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ভাবিতেন। কিন্তু সাধারণ জীবনের ভোগ-সুখকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না। বিদ্যানুরাগী সালাহ্ জাকী-বে ভাব-প্রবণ বিদুষী ছাত্রীকে মাত্র গুরুর চক্ষে দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। জাকীর সংস্পর্শে হালিদাও নূতন দৃষ্টি লাভ করিলেন। জাকীর সহিত তাঁর দার্শনিক তর্ক হইত—পত্রে। কিন্তু জাকীর ক্ষমতা ছিল, জটিল বিষয়কে সরল স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইবার। এতদিন হালিদা রহস্যের বেড়াজালে এক আদর্শ-জ্ঞানের জগতে বাস করিতে-ছিলেন। জাকীর যাদুস্পর্শে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া বাস্তব জগতের লাস্য-সরস মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন —সে আকৃতি কমনীয়তায় পূর্ণ।

১৯০১ সালে মাদাম গ্রাজুয়েট হইলেন। সেই বছরের শেষে প্রবীণ গুরু সালাহ্ জাকী-বের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন —হালিদা এদিব।

গ্রাজুয়েট হালিদা প্রাচ্যের রীতি অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন—স্বামীর সংসারে। বিদুষী পর্দ্দার অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলেন। আদর্শের কৃত্রিমতা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি গৃহ-সজ্জায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

পরিণীত জীবন দেশের কু-প্রথা মানিয়া চলিলেন নব-বধূ হালিদা;—এমন কি, পিতৃ বন্ধুদের পুরুষ-দৃষ্টিরও অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিলেন আপনাকে। তিনি বলেন—"আমি নব-গৃহের ও তার অধীশ্বরেরই সামগ্রী হইলাম। গৃহকে সুখময় করিবার জন্য এবং স্বামীর মহান কর্ম্মের সাহচর্য্য করিবার জন্য আমার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা দান করিলাম।"

বিবাহের পর জাকী-বে "গণিতের অভিধান" সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী হালিদা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ইংরাজ-গণিতজ্ঞ ও দার্শনিকদের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া স্বামীর সাহচর্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ইংরাজ-ঔপন্যাসিক 'কনান ডয়েল' তাঁর 'সারলক্ হোম্‌সে'র ডিটেক্‌টিভ গল্প প্রথম প্রকাশিত করেন। হালিদা তাঁর পিতাকে ও পণ্ডিত স্বামীকে সেগুলি পড়িয়া শুনাইতেন আর তাঁর স্বামী আনন্দে শিশুর মত হাস্য করিতেন। তুর্কীর সুলতান আব্দ ল হামিদও ডিটেক্‌টিভ

উপন্যাস পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁর আদেশে সেগুলি তুর্কী-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হালিদার কিন্তু তখনও মনের ভাব-প্রবণতা খর্ব্ব হয় নাই। তিনি রাত্রে "হরিদ্রা-মুখ মানুষ" আর "কাষ্ঠ-পদ ব্যক্তি"র গল্পের নায়কদের স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইতেন।

হালিদা স্বয়ং ফরাসী-সাহিত্যের অনুরাগিণী ছিলেন। ফরাসী লেখকের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও তার মূল সত্য মাদামকে অনুপ্রাণিত করিত। 'দোদে'র সরস প্রেমের তিনি উপাসক ছিলেন। 'জোলা'র বিরাট সৃষ্টি তাঁকে প্রসন্ন করিত না। আমার মনে হয় তাঁর ঔপন্যাসিক বস্তুতন্ত্রাতামূলক শিল্পের উজ্জ্বলতার মধ্যে মানব-অন্তরের স্বপ্নানুভূতির অভাব। আদর্শ বাদিনী হালিদাকে তাই জোলার শিল্প-নৈপুণ্য অভিভূত করিতে পারে নাই। তাঁর বিশাল বাস্তবতা, সূক্ষ্ম এবং অমল মানসিকতার তুলামানে সঙ্কীর্ণ মনে হয়—একথা জোলা-ভক্তেরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবন-স্মৃতিতে মাদাম হালিদা জোলার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সাহিত্য-বিচারে তাঁর সূক্ষ্ম দর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাস্তব-জীবনের কঠিনস্পর্শের প্রথম প্রতিঘাতেই হালিদা বিপন্ন হইলেন। আদর্শবাদিনী বিদুষী নারী বিবাহ-জীবনের উন্মুক্ত আবরণের ভিতর দিয়া তার নগ্ন সুন্দরতার আমেজ পরিলক্ষণ করিলেন। ১৯০২ সালে তাঁর স্নায়ু দুর্ব্বল হইল। যুবতী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। চোখে নিদ্রা নাই—জীবনে বিষম ভয়—শিরের ভিতর নিরন্তর আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

এই সময় তিনি একেবারে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নিজের শুষ্ক কৃশমুখ তাঁর প্রাণে এমন ভীতি-সঞ্চার করিত যে ভয়ে তাঁহাকে নিজের আবাসগৃহের আরশীগুলাকে কাপড়-চাপা দিয়া রাখিতে হইত। দার্শনিক ভাবে তিনি নিজেকে নিজে দেখিতেন—একজন যেমন অপরকে দেখে। একজন রুগ্না নিরুৎ-সাহ, তিক্ত জীবনের বিষে ভগ্ন-প্রাণ, বিগত-শান্তি-নারী। দর্শক দার্শনিক—নিজের নিপীড়িত-আত্মার দুর্দ্দশায় দরদী।

অনেক স্নায়ু-চিকিৎসক মাদামের চিকিৎসা করিল। কোন ফল ফলিল না। চিকিৎসকেরা একবাক্যে বলিল—অতিরিক্ত ভাবের বন্যায় হালিদা আপনাকে সম্মোহিত করেন, তাই তাঁর জীবনে সাধারণ-ভাব-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এক এক সময় তাঁর পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিত। একদিন ঐ রকম অবস্থায় এক চিকিৎসক যখন রূঢ়ভাবে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল—'কাঁদছ কেন?' তখন হালিদার চমক ভাঙ্গিল। হালিদা দেখিলেন সত্যই তাঁর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

শেষে তাঁর ঐ অবস্থার অবসান করিল তাঁর দিদি মহমুরা। মহমুরার স্নেহের চুম্বন, তার আন্তরিকতার আলিঙ্গন, তার ভালবাসার ভৎর্সনা আর অভিমানের অভিনয়—ধীরে ধীরে হালিদার প্রাণে আবার জীবনের উপলব্ধিকে ফুটাইয়া তুলিল। মহমুরা আল্লা তাঁহার জন্য তুর্কী-স্নানের ব্যবস্থা করিল। তোয়ালে জড়াইয়া স্নানাগারে শায়িতা পীড়িতার বাষ্প-স্নানের স্বচ্ছন্দতার অনুভূতি জীবনের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করিল।

তারপর তাঁর নূতন রকমের পীড়া জন্মিল। নবীন সৃষ্টির চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল তাঁর দেহে। এই সৃষ্টির মাদকতা, অনাগত কালে মাতৃত্বের গৌরব—জগতের নূতন গৌরব আনিল, তাঁর মর্ম্মে।

এই অবস্থায় তিনি একদিন এক স্বপ্ন দেখিলেন। রাশি রাশি অপরিচিত আত্মাকে দেখাইয়া কে যেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'এদের মধ্যে কোনটিকে নেবে তুমি?'

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—আয়াতুল্লা!

আয়াতুল্লা মানে—ঈশ্বরের ইঙ্গিত। সুপ্তার চীৎকারে নিজেরই ঘুম ভাঙ্গিল। আত্মীয়-স্বজন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল—হালিদা পুত্রলাভ করিবে—স্বপ্নে ঈশ্বর এই ইঙ্গিতই দিয়াছেন।

মাতৃত্ব

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রহস্য—নারীজীবনের মূর্ত্ত সার্থকতা, প্রথম সুকুমারের মুখ-দর্শন করিলেন গর্ব্বিতা হালিদা এদিব—মহমুরা আন্নার ক্রোড়ে—কাপড়-জড়ান রোরুদ্যমান স্বর্গ-হতে ঝরা ফুল। তার নামকরণের সময় তিনি বিস্মৃত হইলেন না স্বপ্নের সঙ্কেত—আয়াতুল্লা। তাঁর মাতামহের নামের সহিত স্বপ্নের নাম মিলিয়া কুমারের নামকরণ করিল—আলি আয়াতুল্লা।

আয়াতুল্লার হৃষ্টপুষ্ট দেহ জননীর উত্তেজিত প্রাণকে শান্ত করিল। তার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে তিন মাসের শিশু। তার শিশু-মুখ তার মাতৃ-আননের প্রতিকৃতি। বর্ণ মাতার

মত একেবারে শ্বেত নয়। মাথায় এক রাশ কালো চুল—চক্ষে উজ্জ্বল চাহনি—মানুষের মাটির ধরায় প্রথম প্রবেশ করিবার কালে যেমন দুঃখে কষ্টে ভরা শিশুর চাহনি হয়—তেমন দৃষ্টি ছিল না আয়াতুল্লার। আনন্দের জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল—হালিদার ক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহে এই নূতন সৃষ্টি নবীন প্রাণ উদ্‌বুদ্ধ করিল।

শিশু-পালন

হালিদা হানুমের প্রথম সুকুমার ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁর স্নায়ু-রোগের অবসান হইল। মাতৃত্বের গৌরব তাঁর দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে উল্লাসিত করিল। নবীনা জননীর অন্তরাত্মা আনন্দের রশ্মি-রেখায় উদ্ভাসিত হইল।

প্রাচীন তুর্কী-সমাজের বিধি-নিয়ম অনুষ্ঠিত হইল হানুমের সূতিকা-গৃহে! দুষ্ট পরীদের সন্ত্রাসিত করিবার জন্য সাত দিন লাল সরবত তৈয়ারি হইল। শিশুর ব্যবহারের সকল পদার্থই লাল। প্রসূতির শয্যার নিকট সাদা কাপড়ে বাঁধা দুইটি পিঁয়াজ রক্ষিত হইত—সাদা কাপড়ের পুঁটুলির উপর অবশ্য পরীকে ভয়-দেখানোর লাল রঙের ফিতার ফাঁস বাঁধা। শিশু-পালনের ভার পড়িল একজন গ্রীক নার্শের উপর। লম্বা লাল শালে জড়াইয়া শিশুকে লইয়া যখন ধাত্রী সূতিকা-গৃহে পায়চারি করিত—তার শালের প্রান্ত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইত। খুব পুরু তুর্কী কার্পেট সূতিকা ঘরের মেঝেয় পাতা ছিল—মাদাম বলেন নাই তার রঙ্‌ লাল ছিল কি-না। কার্পেটের উপর শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিবার সময় ধাত্রী সুর করিয়া গাহিত—

'তোলিলিলিকাম্'। এই নিরর্থক শব্দের সুর কিন্তু মাতৃ-হৃদয়কে ভূ-লুণ্ঠিত শালের লহরে লহরে স্পন্দিত করিত। তিনি উপলব্ধি করিতেন প্রথম মাতৃস্নেহের চরম উল্লাস। তিনি আনন্দে গ্রীক ধাত্রীর গলা জড়াইয়া ধরিতেন, আবেগভরে তাহাকে চুম্বন করিতেন। নার্শ অভিভূত হইয়া তরুণীকে শিশুরই মত আলিঙ্গন করিয়া তাহার উদ্দেশ্যেও গান গাহিত, তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিত। এই ধাত্রী বহুদিন মাদামের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল।

বলা বাহুল্য জীবন-স্মৃতির এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় মাদামের অনুভূতির গভীরতা। আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের পাণ্ডিত্য নারীত্বকে চাপিতে পারে না—বিশেষ মাতৃত্বকে। আলি আয়াতুল্লা তাঁহার জীবনের প্রহেলিকার জটিল ফাঁস খুলিয়া দিল। মাদাম বলেন—সে আমায় অতিবিজ্ঞের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। আমার অন্তরে রমণী-সুলভ যে সরল স্নেহ আছে—তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

শিশুর নাম-করণ

ইউজ্‌বেকদের প্রবীণ শেখ যথাবিধি কুমারের নাম-করণ করিলেন। তিনি প্রসূতির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শিশুর কানে আজানের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাঁর গভীর মন্দ্রে তিনবার শিশুকে ডাকিলেন—আলি আয়াতুল্লা আলি আয়াতুল্লা, আলি আয়াতুল্লা।

তিনমাস মাদাম আলি আয়াতুল্লার স্নেহের সাগরে ডুবিয়া

রহিলেন। সারা বিশ্ব জুড়িয়া বাস করিতেছিল এ তিনমাস মাত্র একটি শিশু—আয়াতুল্লা। এ অবস্থায় হঠাৎ হান্নুমের স্বামী তাঁহাকে তাঁহার পিতার রোগের সংবাদ দিল। এবার জননী অনুতপ্তা হইলেন। তাঁর মাতৃত্ব তাঁকে কন্যার কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধা দিতেছিল—এ চিন্তায় তিনি লজ্জিতা হইলেন। হালিদা ছুটিয়া গেলেন হাসপাতালে পিতৃসন্দর্শনে। পিতার নিকট থাকিতে পাইবেন বলিয়া তিনি হাসপাতালের সন্নিকটে এক ইংরেজ বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কুস্বপ্ন

প্রথম রাত্রে হান্নুম এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সুলতান টীপ প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড মাটির ঢিপি ছিল। তাহার উপর ছিল বড় বড় ডুম্বুর বৃক্ষের ঝোপ। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সেই ডুমুর-কুঞ্জে একটি লম্বা অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীলোক এক জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া ঘুরিতেছে। তার ঘন কৃষ্ণ চুলের গোছা তরঙ্গায়িত। এই দুঃস্বপ্নের পর হালিদা বড় মর্ম্মপীড়িত হইলেন। এমন অলক্ষণের স্বপ্ন—তাঁহার স্নেহের দুলাল আয়াতুল্লার তো কোনো অমঙ্গল সূচনা করিতেছে না। কোন যুক্তি সু-সঙ্গত মনে হইল না, মনের জোর দরদের স্রোতে ভাসিয়া গেল। মর্ম্মপীড়ার উপদ্রবে হান্নুম বড় অশান্ত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বিস্ময়ের কুহেলিকা তার মুখে। সে বলিল,

স্বপ্ন-ফল

হান্নুমের স্বামী সালাহ্ জাকী বে পীড়িত। তিনি হান্নুমকে অচিরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

হান্নুম তখনই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অনেক দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। স্বামীর পীড়ার সংবাদ মিথ্যা। নিশ্চয় অমঙ্গল ঘিরিয়াছে তাঁর পুত্র আয়াতুল্লাকে।

ছুটিয়া হান্নুম নিজের কক্ষে গেলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—অধ্যাপক স্বামী। কিন্তু স্নেহের স্রোতকে প্রতিরোধ করেন এমন সাধ্য তাঁর' ছিল না।

গৃহের মাঝে তাঁর আল্লা মহমুরা হেঁট হইয়া কিসের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—হালিদা তড়কার ঝোঁকটা কেটে গেছে। তোয়ালেতে জড়ানো ছিল একটি শিশুদেহ। তখনও তার মুখে তড়কার যন্ত্রণার শেষ রেখাটুকু ছিল। মাতৃ-আগমনে শিশু চক্ষু মেলিল; তার গভীর নীল আঁখির ম্লান মাধুরী—তার শীর্ণ ওষ্ঠের মলিন হাসি, অভিনন্দিত করিল ভীতা চকিতা জননীকে। বাঁচাও আল্লা বাঁচাও আমি তার মরণ চাহি না—বলিল কাতরা জননী।

আয়াতুল্লা বহুদিন তড়কা রোগের সঙ্গে যুঝিয়াছিল। হালিদা হান্নুমও অনন্যকর্ম্মা হইয়া পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে

স্বপ্ন-রহস্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি থাকিবেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর স্নেহের সন্তান থাকিবে অন্য জগতে—এ কল্পনা হান্নুমের পক্ষে ছিল ভীষণ উৎপীড়ক।

কিন্তু তাঁর শিশুর রোগের সঙ্গে জড়ান ছিল সেই স্বপ্নের রাক্ষসী। প্রত্যেক বার আয়াতুল্লার পীড়ার পূর্ব্বে হান্নুম তাকে স্বপ্নে দেখিতেন। সেই অর্দ্ধ-নগ্ন রাক্ষসী স্বপ্নে দেখা দিলেই হালিদা বুঝিতেন তাঁর পুত্র রুগ্ন হইবে। আর তাঁর কোনো চেষ্টা প্রতিরোধ করিতে পারিত না রোগের আক্রমণ। কখনও স্বপ্নের রাক্ষসী সমুদ্র-উপকূলে দেখা দিত, কখনও হালিদা দেখিতেন তাকে সন্তরণশীলা। তার চক্ষের তারা কোনো স্বপ্নে প্রতীয়মান হইত শুক্নো সাগর শৈবালের মত—কখনও মনে হত তারা উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ—মাদামের প্রতি তীক্ষ্ণ বদ্ধ-দৃষ্টি।

তাঁর পণ্ডিত স্বামী অনেক সুযুক্তি অযুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, স্বপ্নের নারী তাঁরই উত্তেজিত স্নায়ুর কল্পিত মূর্ত্তি। কিন্তু সত্যকে অভিভূত করিতে পারিল না জ্ঞানের মীমাংসা। একবার কুড়িদিন মাদাম তাকে স্বপ্নে দেখেন নাই—পুত্রও সুস্থ ছিল। কিন্তু যে রাত্রে সে স্বপ্নে দেখা দিল, তার পরদিন আয়াতুল্লার বায়ু-রোগ দেখা দিল। একদিন স্বপ্ন দেখিবার পর মাদাম ভাবিলেন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবেন না। তিনি বহু দিনের পর বাজার করিতে বাহির হইলেন। কি সর্ব্বনাশ! পথের মধ্যে ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া দুঃসংবাদ দিল—প্রভু-পুত্রের খিঁচুনি সুরু হইয়াছে।

দশ বৎসর পরে সে আবার স্বপ্নে দেখা দিয়াছিল—তার

পূর্ব্বে আয়াতুল্লার প্লুরিশি ব্যাধি হইয়াছিল। বেচারা রোগমুক্ত হইয়া মাতার সহিত আস্তিগোন দ্বীপে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। রাক্ষসী এবার অর্দ্ধনগ্ন রূপে দেখা দিল না। মাদাম দেখিলেন সে বস্ত্রাবৃতা। চক্ষুর বর্ণ কিন্তু শুষ্ক শৈবালের মত। মুখে বিদ্রূপের হাসি। হান্নুম জিজ্ঞাসিলেন—তোমাকে আমি চিনি। বল দেখি তোমার কি নাম?

সে বসিয়া হাসিতে লাগিল। মাদামের নিদ্রা টুটিল—ভীতিবহ্বলচিত্তে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন—চীৎকার করিয়া বলিলেন—এ সেই রমণী! এই স্বপ্ন দেখার তিনদিন পরে আয়াতুল্লা জ্বর-বিকার রোগে আক্রান্ত হইল। বহু কষ্টে সেবারে সে আরোগ্য-লাভ করিয়াছিল। তারপর মাদাম আর সে রাক্ষসীকে স্বপ্নে দেখেন নাই।

এই অদ্ভুত স্বপ্ন-রহস্য তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—যাঁহারা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা-পারম্পর্য্য যে বিচিত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যৌবনে মাদাম হালিদা এদিব ভাবপ্রবণ ও বায়ু-রোগগ্রস্থ (নিউরটিক) ছিলেন।

১৯০৫ সালে মাদাম হালিদা এদিব দ্বিতীয় পুত্র লাভ করেন।

টোগো

সে বৎসর জাপানী-বীর টোগোর খ্যাতি দিগদিগন্ত-প্রসারিত। সুতরাং মাদাম তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখিলেন—হাসান হিক্‌মতুল্লা টোগো।

টোগোর দেহের বর্ণ সোনার মত, সোনার রঙের মাথার চুল আর তার নয়নের তারাও স্বর্ণকান্তি—কাজেই তাদের ভাষা ছিল প্রাণময়ী। আলি আয়াতুল্লা মাদামের অন্তরাত্মার মৃদু কাতরতার প্রতীক। কিন্তু হাসান টোগো সজীবতা ও উৎসাহে পূর্ণ। এগার মাসের শিশু হাসান তুর্কী ও গ্রীক ভাষায় কথা বলিত আর ছুটাছুটি করিত।

এই সময় সালাহ্ জাকী বে সপরিবারে ধেরার হাওয়াঘরে বাস করিতে গেলেন। নূতন বাসগৃহের নিস্তব্ধতা ও মলিনতা মাদামকে আবার অশান্ত করিল। মাদাম আবার সাহিত্য-কাননে সুখানুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তুর্কী ভাষা

আরবের ধর্ম্ম ও ইরাণের কৃষ্টির সাধনার ফলে তুর্কী ভাষা আমাদের দেশের উর্দ্দুর মত একটা মিশ্র ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। ফারসী ও আরবী শব্দ বর্জ্জিত তুর্কী ভাষা ছিল অপাংক্তেয়। কামাল পাশার আমূল সংস্কারের বহু পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী তুরস্ক নর-নারী ভাষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মাদাম তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি অনেক গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচিয়াছেন তুর্কী ভাষায়। জগাতী তুর্কীর বিশুদ্ধতা রাখিবার জন্য তিনি নিজের রচনায় অতি অল্প আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

১৯০৫ সালে নূতন বাসভূমে আসিয়া তিনি যখন আবার সাহিত্যে মনোনিবেশ করিলেন—মহাকবি সেক্সপীয়ার তাঁহার

সেক্সপীয়ার

উপাস্য হইলেন। দুইজন মনীষী তুর্কী ভাষায় সেক্সপীয়ারের নাটকগুলিকে ভাষান্তরিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। মাদামের কিন্তু সে অনুবাদ পছন্দ হয় নাই। তাঁর মতে সেক্সপীয়ার নিজের মনোভাবকে বিকশিত করিবার জন্য একটী নূতন ইংরেজী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। সে ভাষা অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার সরলতায় পূর্ণ। আর এই সরল ভাষার ভিতর দিয়াই তিনি তাঁর নিগূঢ় মানবতা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রচলিত তুর্কীর মত মিশ্রিত ভাষায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হইতে পারে না। এই বিশ্বাসে হালিদা এদিব বিশুদ্ধ তুরাণী ভাষায় হ্যামলেট অনুদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁর অধ্যাপক স্বামী সালাহ্ জাকী বে ইংরেজী অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় হ্যামলেট পড়িয়াছিলেন। মাদামের মতে সেক্সপীয়ারের মনের গভীরতা ব্যক্ত করিতে মার্জ্জিত ফরাসী ভাষা একেবারে অক্ষম। স্বামী কিন্তু অপাংক্তেয় জগাতী তুর্কীতে অনূদিত সেক্সপীয়ার পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনায় বিবাহিতা হালিদা স্বামীকে সেই শিষ্যার চক্ষেই দেখিতেন। কাজেই দিনের পর দিন তিনি সরল তুর্কী ভাষায় হ্যামলেট তর্জ্জমা করিতেন আর গুরু তাঁকে ভৎসনা করিয়া লাল কালিতে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতেন, সহজ তুরাণী শব্দ কাটিয়া জাকী বে আরবী-ফারসী শব্দ বসাইতেন অনুবাদে।

এই সময় মাদাম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ও নারী-প্রকৃতি বিভিন্ন। কতক শিল্প-কলা পুরুষ-প্রকৃতির নিদর্শন, কতক শিল্পে নারী-প্রকৃতির ছাপ উজ্জ্বল। সাহিত্য সৃষ্টির দশা ঐ রকম। কতক স্রষ্টা পুরুষ, কতক স্রষ্টা স্ত্রী শিল্পের রচয়িতা। সেক্সপীয়ার শিল্পীর মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতির। পুরুষত্ব তাঁর ছন্দে, তাঁর ভাষায়, তাঁর বর্ণনায়, তাঁর আখ্যান-বস্তুতে।

এই তুলাদণ্ডে বিচার করিয়া মাদাম সিদ্ধান্ত করেন যে, কোমলতা ও নম্রতা যখন খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-শিক্ষার মুখ্য প্রণালী, তখন খৃষ্টের প্রচারিত বাণী নারী-প্রকৃতিতে পূর্ণ।

খৃষ্ট ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম

কিন্তু পরে রোমক জাতির হস্তে যখন ইহার প্রচার ও প্রসারের ভার পড়িল, তখন খৃষ্টধর্ম্ম পুরুষ-প্রকৃতি-প্রধান রোমক জাতি-সুলভ সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মাদাম বলেন—"সেমিটিক জাতির মধ্যে যে সব পয়গম্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—মোহাম্মদ তাঁহাদের মধ্যে শেষ অবতার হইলেও তাঁহার আত্মা পূর্ব্বতন পয়গম্বরদিগের দ্বারা অতি মাত্রায় প্রভাবান্বিত হয় নাই—যদিও তাঁহারা তাঁহাদের পরম্পরাগত জনশ্রুতি রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল মুসার সংগঠন-শক্তি এবং পুরুষোচিত কর্ম্মক্ষমতা তাঁহার হৃদয়ে ছাপ দিয়াছিল—তিনি ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত পয়গম্বর-লীলার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাই। কারণ মোটের উপর সেই সব মহাপুরুষ বড় গভীর মন্ত্রে

পয়গম্বর

অভিযোগের সুর গাহিয়াছেন—সেগুলি স্থানে স্থানে বড় মধুর, কিন্তু সাধারণতঃ বড় উৎকট ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ। খৃষ্টের উদাত্ত অথচ রমণীসুলভ বাণীও মোহাম্মদকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার প্রেম, তাঁহার করুণা, তাঁহার সামাজিক গঠন-সংস্কার এবং তাঁহার এ-লোকের ও পরলোকের জীবন সম্বন্ধে ধারণা সর্ব্বতোভাবে পুরুষোচিত ছিল।" অপূর্ব্ব মুস্‌লিম জগত-স্রষ্টার ধীরতা, বীরতা ও গঠন-শক্তির উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়—মাদামের হজরত-ভক্তির মূল কোথায়। বিশ্ব-প্রেমকে সাধারণ ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রত্যেক অবতার কেবল বাণীর দ্বারাই জগতের হিতের ব্যবস্থা করেন নাই—অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাঁহারা লোক-শিক্ষা দিয়াছেন। তাই নানা স্বার্থকে সমন্বয় করিবার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধি নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন হজরত মোহাম্মদ। এই বিধি-নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিস্তৃত সমাজ—ইস্‌লাম অর্থাৎ শান্তির অনুষ্ঠান। আরবী ভাষায় পারদর্শিতা ছিল না মাদামের, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কিশোর বয়সে তিনি ইস্‌লামের মূল-সূত্র বুঝিয়াছিলেন তাঁহার পয়গম্বরের উদাত্ত বাণীতে। তাই আমি উপরে তাঁহার নিজের ভাষায় পাঠকের নিকট তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে বর্ণিত হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করিলাম।

কেবল হজরতের উপর তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় একথা বলিলে মাদামের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ঈদ,

বকরীদ প্রভৃতি উৎসব সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা বড় হৃদয়গ্রাহী। ইদলফিতর মুস্‌লিমের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির পোষক—তারুণ্যেই ঈদের •নেমাজ, রোমজানের উপবাসের পর পারণ প্রভৃতি মাদামকে অভিভূত করিত। কিন্তু বক্‌রীদের অসংখ্য মেষ-বলি মাদামের দরদী প্রাণকে অশান্ত করিত।

সাম্প্রদায়িকতা

যে সত্য শাশ্বত, যে বিদ্যা বা চিন্তা অনন্তের তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন চিরদিন মাদাম হালিদা। বলা বাহুল্য তাঁহার মত সকল প্রতিভা-সম্পন্ন নর-নারীর জীবনের ইহাই ব্রত। সুতরাং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাদের বাঁধিতে পারে না। দলাদলির গণ্ডী তাঁহাদের আবদ্ধ রাখিতে অক্ষম। মাদাম জানিতেন ইসলাম—উদার এবং পরধর্ম্মসহিষ্ণু। সত্যের সন্ধানেই ইসলামের অভিযান। অতি সরল কথায় হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন—"যদি জ্ঞানের সন্ধানে ফিরিতে হয় চীনদেশেও যাও।" এই উদাত্ত বাণীর সঙ্গে তিনি সুন্নী সাম্প্রদায়িকতার সমন্বয় করিতে পারেন নাই।

শাশ্বত সত্য অবহিত হইতে পারে প্রকৃত ইস্‌লামের মতে চার রকম প্রথায়। প্রথম প্রমাণ—কোরাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ—প্রথম কয়েকজন ইমামের ব্যাখ্যা। তৃতীয় প্রমাণ—পয়গম্বরের উক্তি। তিনি যে সকল কথা বলিতেন, প্রত্যেক বিষয়ে যে সব মৌখিক বিধান করিতেন, পরে সেই সব কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। আমাদের যেমন স্মৃতি। চতুর্থ প্রমাণ—

প্রত্যেক মানুষের সহজ জ্ঞানের দ্বারা মুসলমান শাস্ত্রের ন্যায়সঙ্গত অর্থবোধ। ইহাকে বলে ইজতিহাদ। কিন্তু গোঁড়ারা ইজতিহাদে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে শরীয়তেই কোরাণ ও ইস্‌লামের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত প্রকৃষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের বাহিরে কোনো ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। শরীয়তের বিধানই চরম।

হালিদা হানুমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ইজতিহাদ বাদ দিয়া ইস্‌লামকে বুঝিতে চাহিত না। তাঁহার মতে গোড়ামী ইস্‌লামের উদারতাকে খর্ব্ব করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস। প্রভু যীশুকে না মানিলে কেহ স্বর্গে যাইবার অধিকার পাইবে না—এ বিবৃতিতে তিনি খৃষ্টের নিজের বাণী-বিরোধিতা উপলব্ধি করিতেন।

বুদ্ধদেব

যখন সকল ধর্ম্মমতের গবেষণায় হালিদা হানুম প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন বুদ্ধের বাণী তাঁহাকে মুগ্ধ করিত, তাঁহার প্রাণে শান্তিদান করিত। এই বৌদ্ধধর্ম্মই কেবল সারা বিশ্বে শান্তিতে জীবন-যাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মোক্ষেই পরম আনন্দ—এ উপলব্ধি মাদামকে অনেক মানসিক ঝঞ্ঝা-দুর্ব্বিপাকে রক্ষা করিয়াছে—তুষ্ট করিয়াছে।

পুলিশের তাড়া

বিবাহের পূর্ব্বে মাদাম যখন কলেজের ছাত্রী, তখন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহাতে সেকালের তুর্কীর সামাজিক অবস্থার নিদর্শন পাওয়া

যায়। তাঁর কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন মিস্ প্রাইস। বস্‌ফরাসে একজন ধনী আমেরিকান 'ইয়াট' নোঙ্গর করিয়াছিল। মিসেস্ মট নামক একজন ইংরেজ মহিলা সপরিবারে সেই আমেরিকার বিলাস পোতে ঘুরিতেছিলেন। মিস্ প্রাইসের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—সেই জাহাজে। তিনি হালিদাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। স্বভাবতঃই তরুণ ছাত্রী তাঁহার সহিত ইয়াটে গেলেন প্রীতিভোজের আমোদ উপভোগ করিবার জন্য।

কিন্তু পুলিশের গুপ্তচর তো অন্ধ নয়। সে বুঝিল এক বিদেশী, এদিব বে'র ষোড়শী কন্যাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে তার অর্ণবপোতে। সুতরাং যখন ভোজের শেষে হালিদা কায়ক (ডিঙ্গি) চড়িয়া ফিরিতেছেন হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করিলেন এক পুলিশের কায়ক্ তাঁহার ডিঙ্গিকে অনুসরণ করিতেছে। তাঁর পানসীর মাঝি মাত্র একজন—পুলিশ-কায়ক বাহিতেছে দুইজন বলিষ্ঠ কায়কজী। ধরা পড়িলে কিছুদিন অন্ততঃ পুলিশের হাজতে বাস করিতে হইবে, এ চিন্তা অস্থির করিল ছাত্রী হালিদাকে। তিনি কায়কজীকে অনুনয় করিলেন দ্রুত পানসী বাহিতে। দেবী চৌধুরাণীর মত তিনি অনুগামী পানসীকে পিছনে ফেলিয়া স্কুটারীতে নামিয়া গাড়ী ধরিলেন; এবং অচিরে গৃহে ফিরিয়া পুলিশের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন।

কিন্তু অপযশ শতকণ্ঠে প্রচারিত হইল—মুখরোচক সংবাদে—

এদিবের কুমারী কন্যা ইংরাজের অর্ণবপোতে অপহৃতা হইয়াছে।

সংবাদ সুলতানের কর্ণে পৌছিল। তুর্কীর মেয়ে তুর্কীর বাহিরে যাইতে পারে না। শেষে যখন তাঁর আত্মীয়েরা সমস্ত কথা যথাযথ বুঝাইয়া দিল, তখন জাঁহাপনা সুস্থচিত্ত হইলেন। তাঁর নীতি ছিল তুর্কীতে অন্যদেশের অপহৃতা সুন্দরী আসিবে; কিন্তু তুরস্কের বাহিরে যাইবে না দেশের কুমারী।

তালাক

১৯১০ সালে মাদামের সুখের বাসা ভাঙ্গিয়াছিল। তাঁহার স্বামীর সহিত একজন শিক্ষয়িত্রীর ঘনিষ্ঠ মিত্রতা মাদামের প্রাণে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রমশঃ তাঁর সন্দেহ ঘনীভূত হইল, যখন তিনি বুঝিলেন শিক্ষয়িত্রী তাঁহার স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। পরে যখন শালাহ জাকী-বে প্রকাশ্যভাবে তাহাকে বিবাহ করিলেন—মাদামের ঘর ভাঙ্গিল। জাকী-বে তাঁহাকে বহু বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেখাইলেন—কিন্তু মাদাম সতীনের সহিত একত্র বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি এক বিবাহের পক্ষপাতিনী চিরদিন। শেষে অনিবার্য্য হইল বিবাহচ্ছেদ।

পুত্রদের লইয়া মাদাম ভূত-পূর্ব্ব স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে গেলেন। লোকে জানিতে চেষ্টা করিল, তাঁহার মন ভাঙ্গিয়াছে কি না। লোকে সন্দেহ করিল তাঁহার যক্ষ্মা-রোগ জন্মিয়াছে

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে জন-হিতকর দেশের কাজে নিয়োগ করিলেন। সরস বক্তৃতায় শিক্ষা দিয়া, এবং পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির চেতনার মধ্যে লুপ্ত করিলেন। ১৯০৮ সালে তুর্কীর সম্রাট আবদুল হামিদকে জন-সভা আহ্বান করিতে বাধ্য করিয়াছিল বিপ্লব-বাদীরা। মাদামের প্রকৃত কার্য্য তখনই আরম্ভ হইয়াছিল। নবীন তুর্কীর বিপ্লবে তিনি শিক্ষা ও সংগঠন কার্য্যে বিশেষ-ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। একথা আমি পরে আলোচনা করিব।

মাদামের স্বরচিত জীবন-স্মৃতি অবলম্বন করিয়া আমি সংক্ষেপে তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিচয় দিয়াছি। তিনি সংস্কারকর্ম্মী ও বিদুষী। তিনি জ্ঞানী ও কবি। কিন্তু রমণীসুলভ দরদ ও অনুভূতি পুরামাত্রায় তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিকের নীরব কঠোরতা তাঁহার নারীত্বকে নিষ্পেষিত করে নাই। তাই সহানুভূতির সরল অনুপ্রেরণা তাঁর স্বজাতি-প্রীতিকে মধুর করিয়াছে।

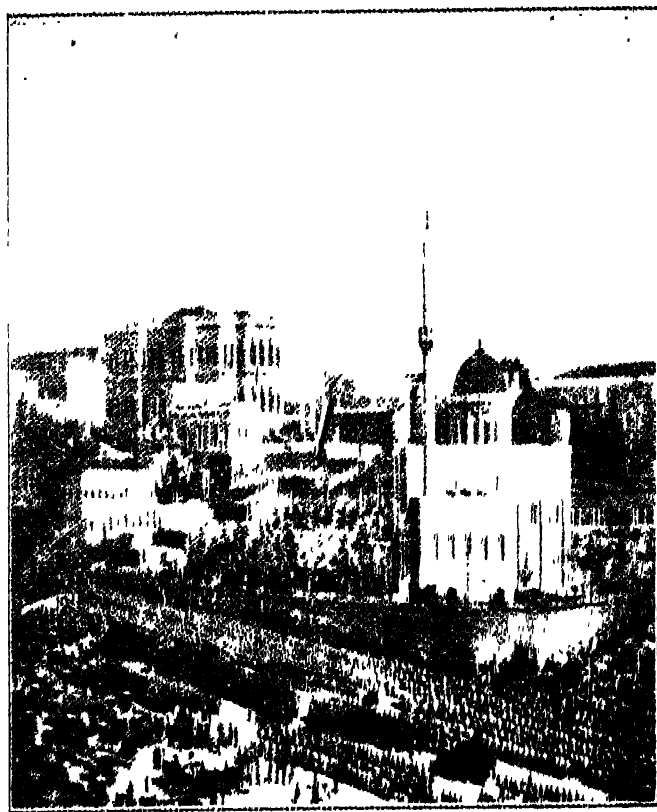
শালাহ্ জাকী-বে

এ প্রসঙ্গে মাদামের ভূতপূর্ব্ব স্বামী শালাহ জাকী-বের শেষ জীবনের কথা বলিব। জ্ঞানের তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং যৌন বিলাসের তীব্র ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বেচারা উন্মাদ হইয়া-ছিলেন। কিছুকাল পাগলা গারদে বাস করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। অনেক বৈজ্ঞানিক পুস্তক তিনি প্রণয়ন

করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের তুর্কী-বিপ্লবের পর পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে স্বদেশে সুলভ করিবার জন্য তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিত অনেক গণিত ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ তুরস্ক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন তুরস্ক

মাদাম হালিদা হানুমের স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদের কারণ বুঝিতে গেলে তুরস্কের ইতিহাস ও তাতার জাতির অভ্যুত্থান ও পতনের রোমান্টিক আখ্যায়িকা বুঝিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে আরবদের হস্ত হইতে সারাসান সাম্রাজ্য অটোমান তুর্কীদের অধীনে আসে। তাহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুস্লিম জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। ক্ষাত্র-ধর্ম্ম তাহারা পালন করিতে লাগিল—আরব মৌলভী ও মোল্লা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সাধনা করিত। প্রায় চারিশতক দক্ষতা ও বীরতার পরিচয় দিয়াছিল অটোমান সাম্রাজ্য—প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যে তাহারা বৈজয়ন্তীন-দের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল। অনেক শাসন-নিপুণ তুর্কী-ভূপতি ও শাসনকর্ত্তা অশেষ প্রকার জনহিতকর কাজ করিয়া সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতকে ইউরোপের খৃষ্টান জাতিদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কদের গৌরব ম্লান হইতে লাগিল। ভ্রমণকারীর দল অসির সম্ভ্রম ভুলিল সিংহাসনে বসিয়া। বিলাস ও ব্যসন নানারূপে নানা প্রলোভনে এদের নষ্ট করিল। ফলে তুর্কীর সুলতান স্বেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল।



তুরস্কের নগর

রাজা স্বেচ্ছাচার হইলে একদল অনুগ্রহজীবী তাঁহার সিংহাসনের ছায়ায় গজাইয়া উঠে। সুলতানের পক্ষে তারা তাঁর উদ্দামতার সেবক—কিন্তু প্রজার পক্ষে এই অনুগ্রহ-জীবীরা হয় ভীষণ আশঙ্কা ও উদ্বেগের স্রষ্টা। রাজ-কোপ অপেক্ষা ইহাদের কোপ সাধারণের আতঙ্ককর। মিথ্যা অপযশ প্রচার ইহাদের অস্ত্র—কাহার ও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা সুলতানের নিকট গুপ্ত অভিযোগ করিত। স্বেচ্ছাচারীকে সন্দেহ ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতে হয়—মাঝে মাঝে তাহাকে সিংহাসন-চ্যুতি এবং গুপ্ত-হত্যার স্বপ্নও দেখিতে হয়। দশজন লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, কোনো যোদ্ধা জনপ্রিয় হইলে, কোনো রাজপুরুষ প্রজা-রঞ্জন করিলে সুলতানের হৃদ-কম্প উপস্থিত হইত। কাজেই রাজকীয় সকল পদে চাটুকার ও অত্যাচারী অধিষ্ঠিত হইত। রাজ্যে কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না—কাহারও সম্পত্তি ভোগ করিবার আশা থাকিত না; যদি না সে রাজপুরুষদের পূজা করিতে শিখিত।

ঠিক যে মাত্রায় তুর্কীর অধঃপতন হইতে লাগিল—সেই মাত্রায় খৃষ্টীয় শক্তির উন্নতি হইতে লাগিল। ইহারা নবীন উৎসাহে তরুণ আশায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। তুর্কীর খৃষ্টীয় প্রজারা মাথা নাড়া দিয়া অনেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুর্কী ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের তুলনায়

অনেক পিছনে পড়িল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে সুপ্ত নগণ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে ব্যক্তিত্বের প্রসার হইল। মানুষে মানুষে সমান—কোন মানুষ কারও অধীনে থাকিবে না—হ'ক সে শক্তিমান পুরুষ, রাজা বা ধর্ম্ম-যাজক—এ চিন্তার ধারা পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যে এক ভীষণ বিপ্লব-বন্যার সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডে এ সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইয়াছিল পূর্ব্বাবধি—তার বিচিত্র পার্লামেণ্ট ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে উচ্চাসনে বসাইয়া এক দিগ্বিজয়ী যুক্ত জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার উপনি-বেশে সে জাতির ভিন্ন শাখার স্বাধীনতা ও সাম্য-বোধ তাহা-দের মতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।

ভীষণ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হইল ফরাসী ' দেশে। শক্তি হিসাবে ফ্রান্স হইয়াছিল খুব বড়। কিন্তু তার শাসন-যন্ত্র ইংলণ্ডের মত স্বাধীনতা ও সাম্যের পোষক ছিল না। ফরাসী জাতি উন্মত্ত হইয়া উঠিল। স্বাধীনতার সংগ্রামে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার নামে অনেক ব্যভিচার ঘটিল। নররক্তে দেশ প্লাবিত হইল। কিন্তু নূতন ভাব-ধারা জগতের সকল পুরাতন বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইল।

ফরাসী বিপ্লবের কালে তুর্কীর সুলতান ছিলেন তৃতীয় সেলিম। তরুণ ভাব-ধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করিল। ইউ-রোপের অনেক পিছনে তুরস্ক—এ কথা তিনি উপলব্ধি করি-

লেন। তিনি সমাজ ও শাসন-যন্ত্রের সংস্কার-কামী হইলেন। উৎকোচ বন্ধ করিলেন, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করিলেন—মানুষের জন্মগত অধিকার মানিতে আজ্ঞা দিলেন সব রাজকর্ম্মচারীদের। বর্ত্তমান যুগে আফগানিস্থানে আমানুল্লার যে দশা হইল, সেলিমের ভাগ্যেও সেই বিপদ ঘটিল। আমানুল্লা রাজ্যচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছে। প্রজা-প্রাণ সেলিম অত্যাচারী রাজপুরুষদের হস্তে প্রাণ হারাইল।

সকল সংস্কার লণ্ডভণ্ড হইল। জানিজারী সৈন্যদল প্রবল হইল। দ্বিগুণ চাপ পড়িল দরিদ্রের উপরে। অত্যা-চার রক্ত-মুখী হইয়া পিশাচ-নৃত্য করিয়া ঘুরিতে লাগিল তুরস্ক সাম্রাজ্যে।

তুরস্কের বাছাই করা সেনার বাহিনীর নাম জানিজারী। চতুর্দ্দশ শতকে স্থলতান ওরখান পরে স্থলতান মুরাদ এই বাহিনী গঠন করেন। তুর্কীর অ-মুসলমান প্রজাকে যুদ্ধ করিতে হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে কিছু অধিক কর দিতে হইত। উপরোক্ত স্থলতানেরা তাঁহাদের খৃষ্টীয় প্রদেশের প্রজাদের বাধ্য করিলেন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সবল বালককে তুর্কী সৈন্যের জন্য দান করিতে। সেই সব যুবকের শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের সহিত দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য তাহাদের প্রথমেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। কথিত আছে, পাছে তাহারা বাপ-পিতামহের ধর্ম্মে ফিরিয়া

জানিজারী

যায়, এই ভয়ে তুর্কী তাহাদের পায়ের নীচে তপ্তশলাকা দিয়া ক্রুশ আঁকিয়া দিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আর খৃষ্টান প্রজারা নিজেদের সন্তান দিল না মুসলমান সুলতানকে। তখন বলিষ্ঠ যুবক হরণের নাকি পালা পড়িয়াছিল। জিন্তু এই বাছাই সৈন্যদল তুরস্কের সুলতানের স্বেচ্ছাচারিতার পোষকরূপে দ্বিতীয় সেলিমের রাজত্বকালে তুরস্কে আধিপত্য করিত। তাহাদেরই প্রতিকূলতা উদার-প্রাণ সেলিমের কাল হইল।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সেলিমের সিংহাসন অধিকার করিল দ্বিতীয় মাহমুদ। মাহমুদ বুঝিল, তুরস্ক সাম্রাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে তুর্কীর নাম লোপ পাইবে। রুশিয়া ও শ্লাভজাতির চাপে পড়িয়া তুর্কী নিষ্পেষিত হইবে। সেলিমের মত করুণ-হৃদয় লইয়া তুর্কী সৈন্য ও রাজপুরুষদের অনিবার্য্য বাধা প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয় মাহমুদ

যে দুর্দ্দমনীয় রাজ-শক্তির সংস্কার ব্রতী হইল মাহমুদ, সেই দুর্দ্দমনীয়তার দ্বারাই সে নবীন তুর্কী গড়িবার সঙ্কল্প করিল। রক্তের স্রোত বহিল দেশে। লোকে ভীত হইয়া নূতন বিধান গ্রহণ করিল—ক্ষণিকের তরে। কিন্তু জানিজারী বীরেরা রাজ-শক্তির নিকটও নতশির হইতে কুণ্ঠা বোধ করিল। তাহারা বিদ্রোহী হইল।

রক্তের স্রোতে কোনদিন কোন দেশে স্বাধীনতা ভাসিয়া

আসে নাই। ফ্রান্সে অর্দ্ধশতক মানুষ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল। ইংলণ্ডে স্বাধীনতা অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাই ইংরাজ দেশের মধ্যে বহু শতাব্দী রক্তপাত দেখে নাই। তার পার্লামেণ্ট প্রজার অধিকারকে এতদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

মাহমুদ জানিজারীদের সঙ্গে তাহাদেরই উপদ্রবের অস্ত্র লইয়া লড়িল। পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিনের মত এক কলঙ্কের কাহিনী অঙ্কিত হইল। সে সমগ্র জানিজারী বাহিনীকে হত্যা করিল। বলা বাহুল্য, তাহাতে উন্নতি দেখা দিল না। জিঘাংসা ও কুপ্রবৃত্তি—দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব তুরস্ককে অধিকতর হীনবল করিল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আব্দুল মজিদ সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, উপযুক্ত সহযোগী না পাইলে, জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বৃথা। তিনি রসিদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। রসিদ পাশা লণ্ডন ও প্যারিসে তুরস্কের প্রতিনিধিরূপে বহুদিন বাস করিয়া ছিলেন। ইউরোপের দুইটী প্রধান জাতির কার্য্যক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন—রসিদ পাশা। তাঁর স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগও ছিল।

আব্দুল মজিদ্

রসিদ সংস্কারের মূলসূত্র ধরিলেন। মানুষের প্রাণ ও সম্পদ স্বেচ্ছাচারিতার অত্যাচার হইতে নিরাপদ হওয়া একান্ত ইপ্সিত। তখন তুর্কীতে প্রজার জীবনের কোন মূল্য ছিল না।

কেবল সূর্য্যের তাপ নয় উত্তপ্ত বালির তাপও ছিল সর্ব্বনাশের কারণ। সুলতান একেলা সারা সাম্রাজ্য ঘুরিয়া তো আর মানুষ মারিতে পারিতেন না! তাঁর কর্ম্মচারীরাও স্বেচ্ছামত মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা ছিল।

রসিদ পাশা

মাদাম হালিদা তাঁর জীবন-স্মৃতিতে অত্যাচারের প্রকার বুঝাইবার জন্য কয়েকটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি এক প্রদেশের কাজী নিযুক্ত হইলেন প্রথামত তিনি প্রাদেশিক শসন-কর্ত্তার গৃহে গেলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য। তিনি যখন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করিলেন এক ব্যক্তি একটা খণ্ডিত-শির আনিয়া গভর্ণরের সম্মুখে রাখিল। নূতন কাজী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাঁচা মাথাটা কোন হতভাগ্যের?

অত্যাচার

উত্তর হইল—সেটা গভর্ণরের গৃহের ভাণ্ডারীর মুণ্ড।

—অপরাধ?

—অপরাধ গুরুতর।—শাসনকর্ত্তা স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। এ বেয়াদবীর জন্য তিনি ভাণ্ডারীর মাথা কাটিয়া আনিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

কাজী তার পরদিনই কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া তল্পী-তল্পা গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন। বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করিল—এ পাগলামীর কারণ কি?

তিনি বলিলেন—গভর্ণরের জাগ্রত অবস্থায় আমি তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিতে পারিব না, তা জানি। কিন্তু তিনি আমায় স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইবেন না—এ ব্যবস্থা করিব কিরূপে ?

একদিন এক উজীর পথ চলিবার সময়—এক নাপিতের দোকান হইতে জল পড়িয়া তাঁর গায়ে ছিটা লাগিয়াছিল। তিনি আজ্ঞা দিলেন, অচিরে নরসুন্দরকে বধ করা হক।

দূত বলিল—হজুর, এ নাপিত আপনারই। একে কি হত্যা করিব ?

উজীর বলিলেন—তাওতো বটে ! হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। আচ্ছা, আর এক বেটা নাপিতের গর্দ্দান কেটে আন।

রাজপুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাই কেবলমাত্র জনগণের ভয়ের কারণ ছিল না। রাজ্যময় গুপ্তচরের প্রাদুর্ভাব ছিল। এদের লোভ, প্রজার ভয়ের কারণ ছিল। ভয় দেখাইয়া অর্থশোষণ করা ছিল এদের একটি পেশা। তাহার উপর কোন নির্দ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ আইন ছিল না। কাজেই প্রজামাত্রেই অসন্তুষ্ট ও শঙ্কিত থাকিত। কর-শুল্কের কোনো নির্দ্দিষ্ট সমতা-মূলক ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ছিল না। এমন কি শ্রম-শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা অবধি ছিল না।

অ-মুসলমান তুর্কী প্রজা তখন সৈন্যবিভাগে স্থান পাইত না। তাহার ফলে গ্রীক, আরমানী ও ইহুদী ছিল বেশ সমৃদ্ধ। কারণ, রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হাতে ছিল। গুণ্ডা,

বদমায়েস, লুঠেরার হাতে তারা উৎপীড়িত হইত নিঃসন্দেহ। কিন্তু যাহার তহবিলে অর্থ থাকে ঘুষখোর-পুলিশ তার ভৃত্য। সুতরাং মোটের উপর তারা ভাল থাকিত। ইউ-রোপের পোষাক, ইউরোপের রীতি, পাশ্চাত্যের পরিচ্ছন্নতায় তারা নিজেদের স্বচ্ছন্দে রাখিত। শিক্ষার প্রচলন ছিল এদের মধ্যে। সমস্ত খৃষ্টান প্রজা এবং অধিকমাত্রায় ইহুদী প্রজা শিক্ষিত ছিল। কিন্তু নিরক্ষর মুসলমান—তুর্কী, আরব, কূর্দ্দ প্রভৃতি ছিল অগণিত।

ধীর ও শান্তভাবে সুলতান আবদুল মজিদ নিজের জীর্ণ কুটীর সংস্কার করিতে ব্রতী হইলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার তিনটি বিচক্ষণ স্বদেশ-প্রাণ সহায়ক জুটিয়াছিল। রসিদ পাশার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রসিদের পুত্র আলী পাশা

জীর্ণ-সংস্কার

ও ফুয়াদ পাশা জীবন পণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধিতে আরম্ভ করিলেন। ধনী ও রাজ-পুরুষদের বিরোধিতা শিষ্ট ও শান্ত ভাবে প্রায় ইঁহারা নির্ম্মূল করিলেন। রাশিয়া নিজেকে খৃষ্টানদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিত। কাজেই খৃষ্টানের উপর অত্যাচার হইতেছে—এই অজুহাত করিয়া তুর্কীর সহিত সে কলহ করিত।

আবদুল মজিদ ফতোয়া দিলেন—সুলতানের চক্ষে তুরস্কের সকল প্রজা সমান। তুরস্ক সাম্রাজ্যে মুসলমান, অ-মুসলমানের অধিকারের কোনো পার্থক্য থাকিবে না। ধর্ম্মসহিষ্ণুতা ইসলামের

ভিত্তি। প্রথম খলিফেরা সেই নীতিতে রাজ্য শাসন করিতেন। মোল্লা, মৌলভীর দলকে বুঝাইয়া তাহাদের বাধা অতিক্রম করিতে সমক্ষ হইয়াছিলেন সম্রাট ও তাঁর অক্লান্তকর্ম্মী দূরদর্শী মন্ত্রীরা।

পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজে তুর্কীর সহায়তা করিয়াছিল এক ইংরাজ মনীষী—লর্ড ষ্ট্রাটফোর্ড ডি রেডক্লিফ। ইনি সে সময় ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে কুস্তনতুনিয়াতে বাস করিতেছিলেন। সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়া, রাশিয়ার হুমকীকে অবহেলা করিতে শিক্ষা দিয়া, পরে রাশিয়ার সমরে ইংরাজের সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করিয়া, ইনি তুরস্কে ইংরাজ-প্রীতির লহর বহাইয়াছিলেন। মহাসমরে তুর্কী জার্ম্মাণ পক্ষ সমর্থন করিবার পর দুই জাতির মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হইল। ফলে ইংরাজের সাহচর্য্যে আরব-বিদ্রোহ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। লরেন্স, এলেনবী প্রভৃতির কথা অধুনিক যুগের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত।

রেড্‌ক্লিফ

এই সময় তুরস্কের সাহিত্য নূতন বল পাইয়া ছিল। প্রায় সমস্ত নাটকই ফরাসী নাটকের অনুকরণে লিখিত। মলিয়া-রের নাটক প্রায় সমস্তগুলিই তুর্কী-ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। তাদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ বোধ হয় মলিয়ারের আদি-রস আর সেই রসে সিঞ্চিত রসিকতা। কারণ তুর্কী-জাতীর মধ্যে বীর-রস আর আদি-রসের পিপাসা সাধারণ।

তানজিম ও সংস্কারের সহায়ক সুলতান অবদুল মজিদ ১৮৬১ খৃঃ অব্দে দেহ রক্ষা করেন।

তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন আবদুল আজিজ।

দেশে জীর্ণ-সংস্কারের পালা পড়িলে প্রত্যেক স্বদেশ-ভক্ত, সকল চিন্তাশীল নর-নারী নিজ নিজ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া

আব্বদুল আজিজ নব্য-তুর্কী নামে একদল সংস্কার ব্রতী শিক্ষিত তুর্কী স্বদেশ-সেবার আয়োজন করিতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের তখন তৃতীয় দশা। সেখানেও লোকে নেপোলিয়নের আত্মীয়ের শাসনে বিরক্ত হইয়া তৃতীয় নেপোলিয়নকে সিহাসনচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। নবীন-তুর্কীর নেতারাও ফ্রান্সে বসিয়া নিজেদের সাম্রাজ্যে হিতের ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছিল—সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসন-পরিষদ। পার্লামেণ্টের অপূর্ব্ব শাসনে ইংরাজ জাতি তখন ইউরোপে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। রাজশক্তি, সামন্ত-শক্তি আর প্রজা-শক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ সীমা নির্ণীত হইয়াছে। তুরস্কে ঐ পদ্ধতিতে রাষ্ট্র শাসিত হইলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিবে—এই আদর্শ লইয়া নব্য- তুর্কীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

আবদুল মজিদ ফতোয়ার দ্বারা সাম্রাজ্যে অত্যাচার দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজাজ্ঞা তো অপ্রতিহত

রাজ-শক্তির একটা বিকাশ মাত্র। আসল প্রয়োজন রাজশক্তিকে গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, রাজপরিষদে প্রজার প্রতিনিধির দ্বারা তাদের সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করা। নবীন তুর্কী চাহিল—শাসন পরিষদ, নির্ব্বাচন, প্রজার সম্ভ্রম।

বেচারা আবদুল আজিজ গণতন্ত্রের সোপান রচনা করিবার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার মত মানসিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। নব্য-তুর্কী ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আজিজকে সিংহাসন-চ্যুত করিল।

নব্য-তুর্কীর এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন মূরাদ। কাজেই তিনি সিংহাসনে বসিলেন। নবীন আশায় নবীন তুর্কী অনু-

পঞ্চম মূরাদ

প্রাণিত হইল—নূতন সম্রাট জাতীয় পরিষদ সৃষ্টি করিলেন। আর সম্রাটের ইচ্ছার উপর মানুষের দণ্ডমুণ্ড নির্ভর করিবে না। বিধি-ব্যবস্থা করিবে প্রজাদের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া।

কিন্তু কোনো পাত্রে স্বচ্ছ অনাবিল জল ভরিতে গেল, পাত্রের মধ্যে ঘোলা জলের তলানী থাকিলে যা' হয়, তুরস্কে তাহাই ঘটিল। প্রত্যেক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের একই সঙ্কেত। যাদের দীর্ঘকাল স্থায়ী অনুপার্জ্জিত স্বার্থে আঘাত লাগে, তারা সংস্কারকের পরিশ্রমকে পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হয়। সিংহাসন হারাইয়া আজিজ আত্মহত্যা করিলেন।

সুলতানের আত্মহত্যা নবীন-তুর্কীর মনোরথ বিফল করিল।

প্রতিপক্ষ রটনা করিল বিপ্লববাদীরা সম্রাটকে হত্যা করিয়াছে। রাজ-ভক্তি প্রাচ্যের লোকের মজ্জাগত। সৈনিকরা গুপ্ত হত্যার বিরোধী। কাজেই তুমুল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। উভয় পক্ষের অভিযোগ ও বাক-বিতণ্ডা দেশের শান্তির পক্ষে হানিকর হইল। তিন মাসের মধ্যে পঞ্চম মূরাদ উন্মাদ হইলেন। পাগলা সুলতান তো আর সিংহাসনে বসিতে পারেন না। সংস্কার-বিরোধী আমীর-ওমরাহ্, পাশাদের দল জয়ী হইল।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আবদুল হামিদ সুলতান বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

আবদুল হামিদ

হামিদ ছিলেন চতুর—কুচক্রী! হাস্য-মুখে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর তুরস্ক-সাম্রাজ্য শাসিত হইবে আইন-সঙ্গত নবীন তন্ত্রে। মিদ্ধত পাশা নব্য-তুর্কীর আশাভরসা—প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইল। নব্য-তুর্কীদের অভয় দান করা হইল—তাহারা গুটি গুটি প্যারী হইতে দেশে ফিরিয়া জননায়ক মিদ্ধতের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছয় মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়া মিদ্ধত, নমীক্, কামাল প্রভৃতি শাসন পরিষদের খস্ড়া প্রস্তুত করিল। আবদুল হামিদ নূতন গণ-তন্ত্রের খস্ড়া অনুমোদন করিলেন।

মিদ্ধত-পাশা সম্রাটের উদার-বাণী বড়-ময়দানে পড়িয়া দেশ বাসীকে শুনাইলেন। তিনি বিধান করিয়াছিলেন যে, এই কনষ্টিটিউসন মতই তুরস্ক শাসিত হইবে! শাসন পরিষদে সকল

শ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধি থাকিবে। অপ্রতিহত সুলতান-শক্তি রাজাজ্ঞায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। নবীনদের হর্ষধ্বনিতে সমস্ত দেশ উল্লসিত হইল —কিন্তু প্রবীণেরা স-সন্দেহে স্তব্ধ রহিল। কিসের হর্ষ! কিসের পরিবর্ত্তন! নির্ব্বাচনের দিনে একজন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বাবা, আমি কিছু কর ধারি রাজ-সরকারে, আমার টেক্স মকুব হবে কি নূতন প্রথায়?

শাসন পরিষদ

পরিষদ বসিবার পূর্ব্বেই আব্দুল হামিদ বুঝিলেন মিদ্ধতের শক্তি আর জনপ্রিয়তা কতদূর। সুতরাং সে কণ্টক না তুলিলে সিংহাসন নিরাপদ থাকিতে পারে না। একটা তুচ্ছ অভিযোগে মিদ্ধত ধৃত হইল এবং তুর্কীর বাহিরে নির্ব্বাসিত হইল। ১৮৭৬ সালে প্রথম 'জাতীয় পরিষদ' বসিল। তরুণ প্রতিনিধিরা খুব গরম গরম বক্তৃতা দিল। রাশিয়ার সঙ্গে তুর্কীর যুদ্ধ বাধিল। দেশে অশান্তি। কঠোরতার সঙ্গে রাজ্য শাসন না করিলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কানের কাছে বক্তা রাজ-দ্রোহিতা প্রচার করিলে দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্য শাসন করা যায় না সুতরাং হামিদ মাস কতক পরেই পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

স্বল্পায়ু পরিষদ

১৮৭৮ সালে ইংলণ্ডের সাহচর্য্যে তুর্কী রাশিয়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইল। বিজয়ী বীরের আদর্শকে মানিলেন আবদুল হামিদ।

মিদ্ধত পাশা

সাধারণ মুক্তি ও ক্ষমা ঘোষণা করা হইল। ১৮৭৮ সালে নির্ব্বাসিত মিদ্ধত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

এই সময় চরিদিকে বিদ্রোহিতার লক্ষণ দেখা দিল। চতুর হামিদ বুঝিলেন মিদ্ধতের সাহচর্য্য ব্যতীত দূরের প্রদেশগুলি আর সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকে না। কাজেই মিদ্ধতকে গবর্ণর করিয়া তিনি প্রথমে রুমানিয়া পরে দামাস্কস্, সিরিয়া এবং অবশেষে স্মার্ণায় পাঠাইলেন।

কিন্তু মিদ্ধত যেখানেই যায় প্রজার হৃদয় জয় করে। তার উচ্চ আদর্শ আর নিবিড় সহানুভূতি তার জনপ্রিয়তা বাড়াইতে লাগিল। অত্যাচারী হামিদের কুটিল সন্দিগ্ধ মন হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। গুপ্ত পুলিশ অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিল যে, সম্রাট আবদুল আজিজের হত্যাকারী মিদ্ধত পাশা। আইনের মর্য্যাদা মলিন হইবার ভয়ে হামিদ মিদ্ধত্কে ধরাইলেন। তাঁর নিযুক্ত বিচারকেরা পুলিশের জাল সাক্ষীকে বিশ্বাস করিয়া বেচারা দেশপ্রাণ মিদ্ধতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

বলা বাহুল্য দেশময় হাহাকার উঠিল। কু-চক্রী হামিদ সন্ত্রাসিত হইলেন। তিনি করুণা দেখাইয়া তাহার প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করিলেন। তার পরিবর্ত্তে মিদ্ধতের যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল। সে তায়েফের অন্ধকূপে বন্দী হইল।

কিন্তু দুই বৎসরেও মিদ্ধতের প্রতি নাগরিকের প্রীতি কমিল না। হামিদের আদেশে মিদ্ধতের বিচারক রেজা পাশা

বেচারাকে গলা টিপিয়া হত্যা করাইল, কারাগারে গুপ্ত হস্তারক পাঠাইয়া।

এই গুপ্তহত্যার সন্দেহ করিয়া মাদাম হলিদা বলিয়াছেন—মিদ্ধত পাশার মত একজন অতি মহাপ্রাণ স্বদেশ-ভক্ত স্বদেশ-প্রেমের জন্য মানব-সাধ্যের সর্ব্বাধিক মূল্য দিয়েছেন।

দমননীতি

আবার দমন-নীতির যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। অত্যাচার-অনাচার এবং গুপ্তচর প্রজার প্রাণ আকুল করিল। প্রথম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র-পোষক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তুরস্কে। তাদের মধ্যে "ইব্রেত" ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। চণ্ডনীতি তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিল। নূতন এক শ্রেণীর কাগজ বাহির হইল—যাদের প্রারম্ভে থাকিত সুলতানের মঙ্গল কামনা, আর বাকী অংশে থাকিত পদোন্নত রাজপুরুষদের তালিকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত আর বিজ্ঞান-জগতের সংবাদ। মাদাম বলেন—দেশভক্তি, মাতৃ-ভূমি প্রভৃতি স্বাধীনতা-বাচক শব্দ তুর্কী ভাষার অভিধান হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল।

দাঁতের উপর দাঁত পিষিয়া তুর্কীর লোক এই সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল। আর তাদের মধ্যে যারা রক্তলোলুপ তারা গুপ্তষড়যন্ত্রীর দলে যোগ দিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশপ্রাণ তুর্কীরা বিধ্বস্ত হইলেও

আদর্শ-বিচ্যুত হয় নাই। হামিদের ভয়ে তুর্কীর বাহিরে গিয়া তাহারা নিজেদের বিপ্লবের সঙ্কল্প প্রচার করিতে লাগিল। নূতন দলের নাম হইল—"একতা ও উন্নতি।"

বিপ্লব

"'একতা ও উন্নতি"—নবীন তুর্কীদের মত নিরুপদ্রব ছিল না। তারা সৈন্যদলের মধ্যে নিজেদের কামনা-সিদ্ধির সহায়ক সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল। তৃতীয় সেনা-বাহিনীর অনেক সেনানায়ক এই দলে যোগদান করিল। এনভার, মুস্তাফা কামাল প্রভৃতির নাম দেশ-সেবকদের মধ্যে এই সময় প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। আমীনা সীমা হানুম ইতিবৃত্ত-লেখক জেবেদ পাশার কন্যা মহিলা ষড়যন্ত্রী।

প্রথম এই গোপন সংবাদ আবদুল হামিদ ১৯০৭ সালে পাইয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও এদের নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই।

তাহার ফলে যেমন সন্দেহে অনেক প্রজা জীবন ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল—সরকার পক্ষেরও কতকগুলি রাজপুরুষকে বিপ্লব-বাদী যুবকেরা গুলী করিয়া মারিয়াছিল।

নিজেদের বল বুঝিয়া চক্রান্তকারী তুর্কীরা আবদুল হামিদের নিকট তারযোগে দাবী করিল যে, অচিরে কনষ্টিটিউশন না ঘোষণা করিলে তৃতীয় সৈন্য বিভাগ লইয়া আমরা সদল বলে কুস্তনতুনিয়ায় অভিযান করিব।

চতুর আবদুল হামিদা ১৯০৮ সালের ১১ই জুলাই তারিখে



ইস্তাম্বুলের মসজিদ

এক ফতোয়া জারি করিলেন—তুর্কী শাসিত হইবে কনষ্টিটিউশন অনুসারে!

বিজলী-বেগে রাষ্ট্রময় এবার প্রচারিত হইল শুভ সমাচার—আবার শাসন পরিষদের সাহার্য্যে দেশ শাসিত হইবে। "সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা ও সুবিচার"—শব্দে

উল্লাস

গগন ফাটিতে লাগিল! ইস্তাম্বুলের পথে-ঘাটে লোকে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয় গাহিতে গাহিতে। যারা প্রবীণ, প্রাণে আশা নাই, অতীতের ঘটনাস্রোতে সন্দিগ্ধমন তারা বলিল—'হায়! হায়! আবার কতকগুলি দেশ-ভক্তের রক্তে মাতৃভূমি কলঙ্কিত হইবে। রক্তের দাগ এখনও শুকায় নাই। এ, হামিদের চালবাজী।' মাদাম হালিদার স্বামীর এক বন্ধু বলিলেন—আজ বহুবার আমাকে মুখ ধুতে হ'য়েছে, কারণ আবেগভরে রাজ্যের লোক আমার মুখ-চুম্বন করেছে।

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পরদিন মাদাম হালিদা ইস্তাম্বুলে স্বচক্ষে দেখিতে গেলেন সহরের অবস্থা। নর-নারীর সমুদ্র—সবার পোষাক লাল আর সাদা—কাতারে কাতারে লোক পথে ঘুরিতেছে। কত-শতকের ঐতিহ্য যেন এক দিনে মুছিয়া গিয়াছিল। নর-নারীর প্রভেদ ভুলিয়া, পরদা ফেলিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা পর্য্যন্ত ভিড়ের মাঝে অবাধে মিশিতেছে। কসাইরা দল বাঁধিয়া স্বাধীনতার উল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে।

দীনহীন 'পারিয়া'ও আবেগভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। খৃষ্টান ও মুসলমান নারী একত্র বাহুবন্ধনে হাসিমুখে সহরে সাম্য-মৈত্রীর জয় গান গাহিয়া ঘুরিতেছে।

বহুদিনের কাতরতা, দমিত স্পৃহা, অতৃপ্ত-তৃষা আজ প্রশমিত হইয়া যুগযুগের রুদ্ধ বেগকে মুক্ত করিয়া দিল। মাদাম শুনিল এক লাল-দাড়ি বৃদ্ধের উচ্ছাস—"আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আছে, আর আছে পাঁচটী শিশু। খোদার কশম এই পবিত্র দিনে আমি তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটতে পারি।" খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান—সবারই আজ রাজ্যে সমান অধিকার। আজ তারা ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে উল্লাস-মগ্ন।

এই ভাব-প্রবণ জনতাকে সংযত রাখা অসম্ভব বুঝিয়া হামিদের পুলিশ একেবারে গা-ঢাকা দিয়াছিল। জননায়করা অশ্বারোহণ করিয়া জনতাকে সুশৃঙ্খলায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। একজন নেতাকে একদল কুর্দ্দী-কুলি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কনষ্টিটিউশন পদার্থটা কি আমাদের বুঝাইয়া দিন।

—কন্‌ষ্টিটিউসন এমন বৃহৎ ব্যাপার যে না জানে সে গাধা—হাসিমুখে উত্তর করিলেন ভদ্রলোক।

—হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয় গাধা—বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিল কুলির দল।

—তোমাদের বাবাও জানতো না কনষ্টিটিউসন কি! বল—আমরা গাধার বাচ্ছা।

আমরা গাধার বাচ্ছা—সমস্বরে বলিল কুলীরা!

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। টানিন—প্রসিদ্ধ কাগজ। উহা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার করিতে লাগিল। "একদম" "বজ্র" "নিন্দুক্" "কৃপাণ" প্রভৃতি নাম দিয়া লেখকরা সংবাদপত্র প্রকাশিত করিল আর তাহাদের মারফত রাষ্ট্রময় গণতন্ত্রের মন্ত্র প্রচার করিল। মাদাম হালিদা এবং তাঁর স্বামী এই সময় বহু প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন 'একতা ও উন্নতি'—সঙ্ঘকে প্রশংসা করিয়া।

সংবাদপত্র

কিন্তু আকস্মিক মুক্তি মানুষের হৃদয়-সাগর মন্থন করিয়া হলাহল তুলিতে লাগিল। প্রত্যেক সঙ্ঘ প্রত্যেক দল নিজের নিজের মত পোষণ করিতে লাগিল—বিপক্ষকে তীব্রভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। দলাদলি, রেষা-রেষি, সাম্প্রদায়িক ঝগড়া, চাকুরীর ভাগাভাগির কোঁদল—তুর্কীকে জর্জ্জরিত করিল। আর প্রত্যেক দলের সংবাদপত্র প্রতি-পক্ষকে গালাগালি দিয়া নিজের নিজের দলের সেবা করিতে লাগিল। হামিদ নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ইহাদের শত্রুতা, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কাহারও সহায়তা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত আশার কেন্দ্র ছিল—প্রজাদের মধ্যে দলাদলি।

সকল দল যে নিরুপদ্রব ছিল তা নয়, আতঙ্কবাদীরা বৈপ্লবিক পন্থায় রক্তের সন্ধানে ফিরিতে লাগিল।

এই নবাগত স্বাধীনতার ফলে ইউরোপের খৃষ্টানেরা তুর্কীর

অনেক জমি আত্মসাৎ করিয়া বসিল। দেশবাসীরা ছিল তখন ঘরোয়া বিবাদ লইয়া ব্যস্ত।

বহু শতক সর্ব্বেসর্ব্বা ভূপতির অনুশাসনে শাসিত হইয়াছিল তুরস্ক। ১৯০০ সালে স্বাতন্ত্র্যের প্রথম অরুণ-কিরণে নবীন আশা নবীন কল্পনা জাগিল প্রজার প্রাণে।

গৃহবিবাদ

প্রত্যেকে ভাবিল তাহারই আদর্শে সম্পন্ন করিবে মাতৃভূমিকে। প্রথম প্রতিনিধি পরিষদে উন্নতিকামী ছোট ছোট অনেকদল একতা সূত্রে নিজেদের বাঁধিল। কিন্তু তাহাতে সংবাদপত্রের দলাদলির অন্ত হইল না। হোজার দল ধর্ম্মের নামে ভীষণ আন্দোলন করিতে লাগিল।

ইসলাম বনাম জাতীয়তা-ধর্ম্মান্ধদের দমন করিবার জন্য উন্নতিশীল সম্মিলিত দল বহু উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ১৯০৯ সালের প্রারম্ভেই রক্তপাতের সূচনা হইল। মাদাম হালিদা পত্র পাইলেন, যদি তিনি উন্নতিশীল দলের পক্ষ বর্জ্জন না করেন, অচিরেই তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। সেনানায়কেরা উন্নতির স্বপক্ষে; কিন্তু মোল্লা, হাজী, রাজ-পুরুষ প্রভৃতির উত্তেজনায় সৈনিকেরা পুরাতন তন্ত্রের পোষক হইতেছিল নায়কদের অগোচরে। দরবেশ বহদেতা নামক এক হোজা জোর গলায় ইসলামের জয়গান করিয়া অজ্ঞদের মুগ্ধ করিতে লাগিল। আরবের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য নবীন তুর্কী তুরাণের বিশিষ্টতা, বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষার প্রবর্ত্তন, জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ প্রভৃতি

প্রচার করিতেছিল। ঠিক এই সব সংস্কারগুলাই যে ধর্ম্মপ্রাণ তুরস্কের অধিবাসীকে কাফের গড়িয়া তুলিতেছিল, প্রতিপক্ষ সেই কথা উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিল।

দরবেশ সাহেব 'ভলকান' নামক এক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

ভলকান

সে বলিল—যদি কাফেরদের দ্বারা শাসিত হইতেই হয়, ঘরের কাফের অপেক্ষা ইংরাজের বা রাশিয়ার অধীনতা ইসলামের কল্যাণকর। নবীন তুর্কী প্রচার করিল যে, দরবেশ বহুদেতা ইংরাজের অর্থে পুষ্ট হইয়া ইংরাজের হাতে তুরস্ক রাজ্য তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ সম্পর্কে তাহারা ফিজমরিস সাহেবের নাম অবধি উল্লেখ করিল। নিজের নিজের দলের কার্য্য-সিদ্ধি করিবার জন্য সকলেই আধা-সত্য এবং পুরো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। স্বার্থান্ধ সঙ্ঘদের উদ্গারিত বিষে রাজনীতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

কার্য্য-সিদ্ধির জন্য জাতীয়তাবাদী তুর্কীরা অনেকগুলি আতঙ্ক-বাদী সমিতিকে নিজেদের দলে লইয়াছিল। আরমাণী

রক্তপাত

তস্‌নক আতঙ্কবাদী সম্মিলনের মধ্যে ছিল। ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে গালাটা পুলের উপর প্রতিপক্ষের সাংবাদিক হাসান ফাহামীকে আতঙ্কবাদীদের একজন গুলী করিয়া মারিল। বলা বাহুল্য, স্থিতিশীলদলের পক্ষে এ ঘটনা হ'ল বিশেষ ফলপ্রসূ।

তাহার মৃতদেহ লইয়া অনুন্নত দল এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিল। শবকে পারস্য-শালে জড়াইয়া তাহার উপর লিখিয়া দিল—আল্লার সেবায় একজন সহীদই যথেষ্ট। শুভ্র-উষ্ণীষ বাঁধিয়া দলে দলে লোক অনুসরণ করিল সেই সহীদ সমাধির শোভাযাত্রা। তাহারা নীরব—নির্ব্বাক। প্রশান্ত জনতা যেন ঝড়ের নীরব অগ্রদূত! জাতীয়তাবাদীরা হাসিয়া বলিল—ভয় কি? আমাদের সৈন্য আছে বন্দুক আছে।

মার্চ্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই সৈনিকেরা বুঝাইয়া দিল তাহারা কোন পক্ষে। মার্চ্চের শেষ দিনে তারা ইস্তাম্বুলে অভিযান করিল। বিদ্রোহী সৈনিকরা জাতীয়তাবাদী নায়কদের প্রকাশ্য-হত্যায় উন্মাদনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। পার্লা-মেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আহমেদ রেজা এবং হোসেন জাহাদ নামক দুইজন বিশিষ্ট নেতাকে তাহারা হত্যা করিল। নিহত দেশ-হিতৈষীদের শব লইয়া তাহারা তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

এই সময় রক্ত-লোলুপ তুর্কী-জনতা আদানায় আরমাণীদের নৃশংসভাবে হত্যা করিল। সে কাহিনী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই

আরমাণী হত্যা

পাশব নরহত্যার সাফাই দিয়াছেন মাদাম। আরমাণীরা বলে—এ হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল নবীনতুর্কীর দ্বারা। ইংলণ্ড সেই কথাই বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু মাদাম বলেন—এ নিষ্ঠুর জিঘাংসার জন্য নবীন তুর্কী বা জাতীয়তাবাদী

দায়ী নয়। তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইয়াছে আরমাণীরা।

আরমাণীদের তসনক নামক বিপ্লববাদীদের সঙ্গে লইয়াছিল জাতীয়তাবাদী তুর্কী। কিন্তু আরমাণীরা রাশিয়ার পরামর্শে স্বাধীন আরমাণী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। একতা নষ্ট হইলে ইউরোপের নিকট পরাস্ত হইবে তুরস্ক—এই ভয়ে নবীন তুর্কী আরমাণীকে সমান অধিকার দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ছিল বিচ্ছেদের অনুকূলে। তুর্কীজনতা স্থিতিশীলদেরই প্ররোচনায় উত্তেজিত হইতেছিল। বিপ্লববাদী আরমাণীরা তাদের উপর বোমা ফেলিয়া মুসলমানদের উচ্ছেদ করিবে এই আতঙ্কে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমান আরমাণীদের হত্যা করিয়াছিল। মাদাম হালিদার এই অভিমত। তাঁহার বিশ্বাস যে, নিজেদের স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রত্যাশায় এবং ইউরোপের সহায়তা পাইবার লোভে আরমাণীরা নবীন তুর্কীর ঘাড়ে চাপাইয়াছিল এই কদর্য্য নরহত্যার কলঙ্ক।

অবশ্য মাদাম সমকালের কার্য্যাবলী বিচার করিয়াই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা। কিন্তু সে সময় সকল পক্ষই যে অন্ধ হইয়া রক্ত-লোলুপ হইয়াছিল—সে কথা নিঃসন্দেহ। হিংসার বিষ কস্মিনকালে কেবল এক পক্ষের জিঘাংসার উদ্রেক করে না। হিংসার প্রতিঘাত হিংসা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থিতিশীল পাল্টাবিপ্লবীর দল মাদামকে

হত্যা করিবার সাধু সঙ্কল্প তাঁহাকে পত্রযোগে জানাইয়াছিল।

মাদামের পলায়ন যখন রাজনৈতিক-প্রতিদ্বন্দ্বী-বধের তাণ্ডবলীলা প্রবর্ত্তিত হইল, মাদামের কল্পনাপ্রবণ মন মৃত্যুর বিভীষিকায় কম্পিত হইল। তাঁহার স্বামী সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিল—পাণ্টা বিপ্লব বাস্তবিকই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। লেবানের প্রতিনিধিকে অসংযত জনতা টুকরা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। রাষ্ট্র-সচিব নাজিরপাশাকে উত্তেজিত সৈনিকেরা পার্লামেণ্টের ফটকের সম্মুখে গুলি করিয়াছে। এক বন্ধু সংবাদ দিল যে, মাদাম হালিদার নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই তাঁহাকে হত্যা করা হইবে।

তাড়াতাড়ি নিজের পুত্রদের লইয়া দীন ছদ্মবেশে স্কুটারিতে তাঁহার পিত্রালয়ে পলাইলেন মাদাম। পথে গুলী চলিতেছিল। একটী জনতা আসিয়া তাঁহাদের ধাক্কা দিল। এ লোকগুলী সৈনিক। তাহারা তাহাদের নায়কদের গুলী করিয়া ছুটিতেছিল—ইস্তাম্বুলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে। তাহারা মাদামকে চিনিত না; কাজেই, তাঁহার সে যাত্রায় প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

তাঁহার পিত্রালয়ও নিরাপদ ছিল না। সারারাত গুলির আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। আর লণ্ঠন হাতে লইয়া জনতা ঢাক পিটিয়া সারা সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ভয়ে মাদাম ঘরের এক কোণে সারারাত্রি আশঙ্কায় বসিয়া ছিলেন। তাঁর ত্রস্ত শিশু

পুত্র দু'টী জননীর জানু ধরিয়া শঙ্কাচকিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বন্দুকের শব্দে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পরদিন প্রভাতে সকলে বুঝিল তাঁহার পিত্রালয় মোটেই নিরাপদ নহে। অনেক লোক সন্দেহে তাঁহাদের গৃহের চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে এক প্রশস্ত বাগানের মধ্যে ছিল ইউজবেগদের একটী আশ্রম। রাত্রে পুত্রদের লইয়া অন্ধকারের অন্তরালে মাদাম আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানকার সাধুরা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে একজন বিপ্লবী তাঁহাদের সন্ধান পাইল। সুতরাং তুর্কী ছাড়িয়া না পলাইলে আর মাদামের রক্ষার উপায় ছিল না।

এক দীন জীর্ণ কালো বোরখায় নিজেকে ঢাকিয়া পুত্রদের মালীর ছেলেদের পরিত্যক্ত পোষাকে ছদ্মবেশ করিয়া মাদাম মিশরে পলাইলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি কিছুদিন মিস্-প্রাইসের আমেরিকান বিদ্যালয়ে লুকাইয়াছিলেন। পাল্টা বিপ্লবের দিনে আমেরিকার ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা জাতীয়তাবাদী অনেক তুর্কীকে আশ্রয় দান করিয়াছিল।

মিশরে মাদাম

যে জাহাজে মাদাম মিশরে গেলেন সেই জাহাজে একটী আধাকালো আধাসাদা নিগ্রো স্ত্রী-লোক যাইতেছিল। যে কক্ষে মাদাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই কক্ষে সে রমণীও মিশরে যাইতেছিল তুরস্কের হাঙ্গমার ভয়ে। মাদাম কালো বোরখায় ঢাকা—'আসন পিঁড়ি' হইয়া নিজের বেঞ্চে বসিয়াছিল। আতঙ্কে

তাঁহার দেহ হইয়াছিল নিস্পন্দ! নিগ্রো-স্ত্রীলোকটা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিল—'এখানে আবার একটা কালো পোঁটলা রাখিল কে?' যখন মাদাম ঘোমটা খুলিয়া ইংরাজীতে বলিল "শু সন্ধ্যা" তখন নিগ্রো-রমণী আদর করিয়া বলিল—"ওমা, তুমি যে ঠিক আমার সুসীর মত দেখতে।"। এই বলিয়া সে মাদামের মুখ চুম্বন করিল। সুসী অবশ্য তাহার কন্যা। সুসীর পিতা একজন ফরাসী। তাঁহার দারুণ বিপদে পাঁচদিন এই কদর্য্য নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গ মাদামের বিষদকে কতখানি তীব্র করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মিশরে তাঁহার পুত্রদের পীড়া হইয়াছিল। পরে তাঁহার স্বামী তাহাদিগকে দেশে লইয়া আসেন এবং মাদাম মিশর হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। জাহাজে সুসীর-মা নিগ্রো-রমণী যখন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গোপনে প্রেম করিত,—মাদামের কী ঘৃণার উদ্রেক হইত, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

খৃষ্টান ইউরোপে মুসলমান তুর্কী ছিল অমুসলমানের চক্ষুশূল। যেমন ১৯০৮ সালে নবীন তুর্কী বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিল, অষ্ট্রীয়া,—বস্‌নিয়া, হর্জ্জগোবিনা দখল করিয়া বসিল। সে সময় তুরস্ক গৃহবিবাদে ব্যস্ত। তার এমন শক্তি ছিল না যে, অষ্ট্রীয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তুর্কী দুর্ব্বলের অস্ত্র গ্রহণ করিল। পাড়ায় পাড়ায় দল বাঁধিয়া শোভাযাত্রা করিল—উত্তেজিত মর্ম্মাহত তুরস্ক জনতা। অষ্ট্রীয়ার পণ্য বয়কট করিবার প্রস্তাব করিল ক্ষুব্ধ

গৃহবিবাদের ফল

তুর্কী। সংবাদপত্রগুলিও কাগজে কলমে অষ্ট্রীয়ার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। লাল তুর্কী ফেজ অষ্ট্রীয়ায় নির্ম্মিত হইত। তুর্কীরা লালটুপী ছাড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময় তুর্কীর পররাষ্ট্র সচিব বিশকোটি তুর্কী-মুদ্রা লইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত বিবাদ মিটাইয়া প্রজাদের কোপ ও নূতন তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষকে আরও তীব্র করিল। তুর্কীজাতি জয়-পরাজয়ের একই প্রণালী অবগত ছিল—সংগ্রামে রক্তপাত। অর্থ লইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করা তুর্কীর রাজনীতিতে এই প্রথম অনুষ্ঠান। পাল্টা বিপ্লবের এই ঘটনা হইয়াছিল একটী প্রধান উত্তেজনার কারণ।

গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট দ্বীপ এতদিন ছিল তুর্কীর অধীন। এই সুযোগে ক্রীটের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের দেশ গ্রীসের হাতে তুলিয়া দিল। তুরস্করাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। উত্তেজনায় ও কোপে তুর্কীরা গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল—ক্রীটই আমাদের প্রাণ, তার জন্য বহুক রক্তের স্রোত। কিন্তু কার্য্যে কোনও সুফল ফলিল না।

১৯১০ সালে সুযোগ বুঝিয়া ইটালী ট্রিপলী দখল করিয়া বসিল। আফ্রিকার এতবড় প্রদেশ বিনা অজুহাতে ইটালী আত্মসাৎ করিবে, এ ধৃষ্টতা তুর্কী-জাতির নিকট অসহ্য বোধ হইল। স্বদেশভক্ত কাগজ 'তানিন্' প্রভৃতি ইটালীয় মাল বয়কট করিতে পরামর্শ দিল। সে ধুয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। আমার মনে আছে, ১৯১০ সালে ভারতবর্ষীয়

ট্রিপলী

মুসলমানেরাও ইটালীর পণ্য বর্জ্জন করিয়াছিল। ইটালী হইতে হাজার হাজার টাকার মাকারণী সিমুই তুর্কীতে ব্যবহৃত হইত। তুর্কীরা সিমুই খাওয়া ছাড়িয়া দিল। সে যুদ্ধে ইটালী পরে জয়লাভ করিয়া ছিল। এ কথা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

১৯১০ সালে আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হইলে, তাঁহার স্থানে পঞ্চম মহাম্মদ সুলতান হইলেন। ১৯১১ সালে বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলকান যুদ্ধের শেষে ইউরোপে তুরস্কের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইল। কিন্তু তুরস্কে জাতীয়তা-বাদ ও শিক্ষা, বিশেষ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারিত হইতে লাগিল। মাদাম হালিদা ও নাবী হানুম প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম মহাম্মদ

১৯১২ সালে বলকান সমর আরম্ভ হয়। নূতন উদ্দীপনায় বলকান মিত্রশক্তি তুর্কীকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল তুরস্কের সমর-নীতির অসারতা। মাদাম হালিদা আক্ষেপের সঙ্গে তুর্কীর বে-বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আড্ডায় গাড়ীভরা ভেড়া, ময়দা প্রভৃতি রসদ ছিল, কিন্তু তারই অনতিদূরে খাদ্যাভাবে রাশি রাশি সৈনিক কাল-কবলিত হইতেছিল অনাহারে। আসল কথা ব্যক্তিগত সাহস বা শক্তি তুর্কীর থাকিলেও নবীন যুদ্ধনীতি সে জানিত না। আব্দুল

বলকান যুদ্ধ

মজিদের রাজত্বকালে অনেক যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু আব্দুল হামিদের অদূরদর্শী রাজনীতির ফলে সেগুলি বস্‌ফরাসে আবদ্ধ ছিল। ইউরোপীয় আদর্শে সেনা-নায়ক গড়িলে তারা বিদ্রোহী হইতে পারে, সেই সন্দেহে হামিদ মধ্যযুগের রণনীতি শিখাইয়াছিল নিজের সেনা-নায়কদের। এসব অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ করিল তুরস্কের স্বদেশ-ভক্তেরা, যখন স্বায়ত্ত-শাসন ভার তাদের হস্তে ন্যস্ত হইল। নিন্দা হইল তাহাদের, ক্ষতিগ্রস্থ হইল রাষ্ট্র।

দলাদলির ফলভোগ করিল তুরস্ক—মহাসমরে যোগদান করিয়া। অত্যাচারী ভূপতি নিজের স্বার্থের জন্য জাতিকে অজ্ঞ করিয়া রাখে। সুতরাং সে যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করে, হাঁটিবার বিদ্যাও তার থাকে না।

মহাসমর

কারণ রাজনীতি অতিশয় দক্ষতা ও দূরদর্শিতা সাপেক্ষ। সে বিদ্যা বাড়ে বহুদর্শিতার ফলে। এ ঠেকে-শিখা-বিদ্যা থাকে না তাদের, যারা নিজের হাতে বহুদিন রাজ্য-শাসনভার না পাইয়াছে। ইংলণ্ডে ক্রম-ওয়েলের সাথীরাও অগাধ স্বদেশ-ভক্তি ও সাধু-সঙ্কল্প লইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৮৮খৃঃ অব্দের নিরুপদ্রব রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে ইংরাজ জাতি ধীরে ধীরে সমস্ত ভার নিজেদের হাতে লইয়া অনেক ঠোক্কর খাইয়া বহুদর্শিতালাভ করিয়া রাজ্য-শাসন ব্যাপারে জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ শিকল কাটিয়া ফরাসী একশত

বৎসর অনেক পরীক্ষা করিয়া তবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে শিখিয়াছিল। নবীন স্বায়ত্তশাসন নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

তুর্কীর দশা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ তুর্কী-প্রজার নিজের জীবন ও স্বাধীনতা ছিল অন্যের তত্ত্বাবধানে। মহাসমরের সময় বিচক্ষণ তুর্কী-নেতারা ইউরোপের সমর ক্ষেত্রে নামিতে চাহে নাই—অনেকে অবসর লইলেন। কিন্তু নিয়তি তাহাকে নামাইল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে।

অনেকের বিশ্বাস তুরস্ক যদি জার্ম্মাণীর পক্ষ সমর্থন না করিত মহাসমরের অন্তে আজ তাহাকে এতদূর ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হইতে হইত না। আরব ইংরাজের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল অনেক পরস্পর-বিরোধী নেতাকে একতার সূত্রে বাঁধিয়া। অবশ্য মানবতার দিক হইতে সকল জাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তুর্কীর পক্ষ হইতে সিরিয়া, মেশোপোটেমিয়া, আরব প্রভৃতি হস্তান্তরিত হওয়া আক্ষেপের বিষয়। অতীতে তুর্কী ও সারাসানে মিলিয়া ধর্ম্মের বন্ধন লইয়া একতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন তুর্কী একেবারে ভিন্ন পথে চলিয়াছে—আরবও নিজের পথ চিনিয়াছে। অনাগত কালে এই পার্থক্যের ফল বুঝিতে পারা যাইবে, কিন্তু তুর্কী যদি ১৯১৪ সালে মিত্র-শক্তির সহিত ভাগ্য মিলাইত—আরব ও তুরস্কে বিচ্ছেদ হইত কি না বলা কঠিন।

মাদাম হালিদা এবিদের জীবনস্মৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে

পারা যায়, আরব ও তুরস্কের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বহুদিন। অর্দ্ধশতকের উপর

আরব ও তুরস্ক

তুর্কীজাতি ভাষায়, ভাবে, আচারে, ভাবধারায় আরবের প্রভাব মলিন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কামাল পাশার নূতন রীতি প্রবর্ত্তনের বহু পূর্ব্বেই ঐ রীতির বীজ রোপিত হইয়াছিল তুরস্কে। জীবন-স্মৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মুস্তাফা কামাল পাশা বহুদিনের ঈপ্সিত সংস্কারকে অতি-মানুষের দৃঢ়তার সঙ্গে দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এখন মাদাম হালিদা মুস্তাফা কামালের বিপক্ষে। কিন্তু তাঁহার জীবনস্মৃতি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উন্নতিশীল তুর্কী নর-নারী দেশের শুভ কামনায় ঐ সব বিধানই চাহিয়াছিলেন। কেবল রোমক লিপির আকাঙ্ক্ষা অতি-নবীন। তুর্কীর দেশ-প্রাণ মনে যে সমগ্র তুরাণী একত্রীকরণের লালসা ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ।

অন্যান্য ইতিবৃত্তকার ও সমকালের লেখকদের বর্ণনা হইতে আমরা ঐ কথাই বুঝিতে পারি। তুর্কীর মনে বিজয়ীর গর্ব্ব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে আরবের ধর্ম্ম লইয়াছিল, আরবী মোল্লা মৌলবী হোজারা সরল ভাবে ইসলামের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত। অল্-কোরাণের ভাষা—আরবী পয়গম্বর তাদের মাঝে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মুস্লিমের তীর্থ স্থান আরব দেশে, এই সকল কারণে আরবের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবনতশির হইতে হইত তুর্কীকে। আর ঠিক ঐ সব কারণে আরবের মনেও

শ্রেষ্ঠতার অভিমান ছিল। তুর্কী রাজপুরুষ আরবের উপর রাজ-পুরুষ-সুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত। কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে ভেদ-জ্ঞান ক্রমশই বাড়িতেছিল। প্রসিদ্ধ-ইতিবৃত্তকার হানস্ কোহেনও নবীন তুর্কীর তুরাণী প্রীতির ও আরব বিদ্বেষের বর্ণনা দিয়াছেন। আরব স্বাধীনতার একজন প্রধান সহায়ক টি বি লরেন্স—ইংরাজ কর্ম্মবীর। ইনি বিভিন্ন বেদ্দু জাতিকে আমীর হুসেন ও ফয়জালের সহিত মিলাইয়া আরব স্বাধীনতা লাভ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। এ ইতিহাস অতি আধুনিক—পাঠক মাত্রেই অবগত। তুর্কীর উপর বেদ্দদের বিতৃষ্ণার একটা কাহিনী লরেন্সের 'রিভোল্ট ইন দি ডেজার্ট' নামক চিত্তাকর্ষক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব।

আউদা আবুতায়ি আরবের একজন প্রধান বীর সামন্ত। তার সাহচর্য্যে ফয়জাল আকাবা দখল করিবার আয়োজন করিতেছিল। ওয়েঝ মরুপ্রান্তে ফয়জালের শিবির। সকলে বসিয়া পরামর্শ আঁটিতেছে। লরেন্স তুর্কীর অনেক রেল ভাঙ্গিয়া মদিনা বিজয়ের পথ সুগম করিয়াছে। অকস্মাৎ শিবিরে প্রবেশ করিল সপুত্র আউদা।

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর যখন যুদ্ধের সমাচার দিতে সবাই ব্যস্ত—আউদা হঠাৎ গভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিবারণ কর আল্লাহ্'। সে দ্রুত শিবিরের বাহিরে গেল। সবাই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। বাহিরে হাতুড়ী পেটার শব্দ হইতে লাগিল। লরেন্স বাহিরে

গেল—দেখিল আউদা বীর পাথরের আঘাতে তার কৃত্রিম দাঁত চূর্ণ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ!—ব্যাপার কি সেখজী?

ব্যাপার গুরুতর। সে দাঁতের পাটি তাকে উপহার দিয়াছিল জামালপাশা—একজন তুর্কী। সে কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। আজ তুর্কী-বিদ্বেষের হোমাগ্নির সম্মুখে অকস্মাৎ তার স্মৃতি জাগরিত হইল। কি অন্যায়, এতদিন সে খোদার রুটি তুর্কীর দাঁতে খাইতেছিল। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র সে দশন পংক্তির বিনাশ সাধন করিল। আউদা বড় মাংসাশী ছিল—দন্তবিহীন তুণ্ডে সেকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবার আশা না দেখিয়া মিশর হইতে লরেন্স তার জন্য এক পাঁতি মিত্রশক্তির দাঁত আনাইয়া তার তুর্কীবিদ্বেষ বাড়াইয়া দিল।

মহাসমরেরের সময় তুর্কীতে জার্ম্মাণদের কর্ত্তৃত্বের যে সব কথা ইটস ব্রাউন প্রভৃতি নিরপেক্ষ লেখকদের পুস্তকে পাঠ করা যায়, মাদামের জীবন-স্মৃতি হইতে সে কথার আভাষ পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালে মাদাম স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য নাবী হাসুমের সহিত শিরিয়া ও আনাটোলিয়ায় ঘুরিতেছিলেন। আঁয়তুরায় তাঁদের একজন জার্ম্মাণ স্ত্রীলোক একটি কক্ষে লইয়া গেল; বলিল—লোকে সোনা বে-আইনী আমদানী রপ্তানি করিতেছে। আমরা তোমাদের খানাতল্লাস করিব। সেই ঘরে একটি পুরুষ ছিল। মাদাম বলিলেন—ঐ পুরুষটিকে ঘরের বাহিরে না পাঠাইলে আমি তল্লাসী দিব না।

জার্ম্মাণ প্রভাব

জার্ম্মাণ রমণী বিশেষ কুপিত হইয়া বলিল—জান উনি কে? উনি উচ্চবংশের অষ্ট্রীয়ান—উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ও সব তুর্কীর কিচির-মিচির চলবে না। আমি যা ইচ্ছা করতে পারি।

মাদাম প্রতিবাদ করিলেন। সে জোর করিয়া তাঁর কাপড় খুলিতে গেল। মাদাম মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁর স্মরণ নাই ক্রোধে তিনি কি করিয়াছিলেন।

তারপর হাজতে তাঁর জ্ঞান হইল। পুলিশের নিকট তাহারা তাঁর নামে রাজদ্রোহ, রাজপুরুষকে প্রহার করা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ করিল। সে লম্বা গল্প। শেষে সরকার পক্ষ হইতে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণরা যে তুরস্কে প্রভুত্ব করিত যুদ্ধের সময়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না।

তাই বলিতেছিলাম, তুর্কী রুশীয় যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা পাইয়াছিল—গণতন্ত্রের আদর্থ পাইয়াছিল। ফ্রান্সের নিকট বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কৃষ্টির জন্য ঋণী ছিল তুর্কী তবু কেন সে মহাসমরে তাহাদের পক্ষ ছাড়িয়া জার্ম্মাণীর সহিত ভাগ্য মিলাইল, একথা বুঝিয়া উঠা কঠিন। জার্ম্মাণ দৌত্যের কৃতিত্ব ছিল তুর্কীকে যুদ্ধে লিপ্ত করায়। এখানে ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসি পরাজিত হইয়াছিল। মহাসমরে তুর্কী ইংরাজের পক্ষে থাকিলে ভারতবাসীকে ইরাক অভিযানে তাহাদের বিপক্ষে লড়িতে হইত না।

দলাদলির কুৎসিৎ উৎপীড়নে তুর্কীর দেশহিতৈষীরা সংগঠন-

মূলক কোনো কার্য্য করে নাই—একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। নবীন স্বাধীনতা মানুষকে ঠিক ইষ্টের পথে উন্নত করে না— আদর্শ বিরোধিতার হাঙ্গামায়। তার উপর স্বার্থানুসন্ধীর দল তো চিরকাল সকল সমাজের রক্তপান করিতে ব্যস্ত। ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধের অবসান হয়। আদ্রিয়ানোপল তুরস্কের শাসনে ফিরিয়া আসে। তখন সংগঠন ও সংস্কারের দিকে মন দিল দেশ-হিতৈষীরা। রাজস্ব বিভাগে আয়-ব্যয়ের সমীকরণ না করিলে কোন রাষ্ট্র স্বচ্ছন্দে শাসিত হইতে পারে না। জাবিদ বে ফরাসী সহায়কের সাহচর্য্যে রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ইউরোপের প্রণালীতে নিজের দপ্তর সংস্কার করিলেন। ইংরাজ সহায়ক সার রিচার্ড ক্রফর্ডের তত্ত্বাবধানে শিরি বে পণ্য শুল্কের নবীন প্রণালীতে সংস্কার কবিলেন। এনভার বে জার্ম্মাণ সৈনিক নিযুক্ত করিয়া তুর্কী সৈন্তকে জার্ম্মাণ যুদ্ধ-নীতি শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। দুইজন ইংরাজ নাবিক-যোদ্ধার সহায়তায় নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা হইল। বিচার বিভাগে তাহারা ইউরোপের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ মুস্তাফা কামাল পাশার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তুর্কীজাতি প্রাচ্য শৈথিল্য এবং প্রাচীনকালের গৌরবের স্মৃতি-মাত্র লইয়া রাজ্য-শাসন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে মনস্থ করিয়াছিল। উন্নতিশীল ইউরোপীয় জাতিদের গঠনমূলক প্রথার কার্য্যকারিতা তাদের

সংগঠন

মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রাচ্যের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের পরিপন্থী নয় পাশ্চাত্যের সংগঠন বিধি। নিজেদের জাতীয় আদর্শকে স্থিতিশীল করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রথমে শিক্ষা-বিভাগকে নবীন তুর্কী স্বদেশ-বাসীর অধীনতায় রাখিয়াছিল। আর মাদাম হালিদার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল শিক্ষা-সংস্কার। তাঁর সাহিত্য—বিশেষ কথা-সাহিত্য রচনার খ্যাতি সমস্ত তুরস্কে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল! তাঁর বিদ্যা ও নবীন প্রেরণা তুরস্কের সম্পদ ভাবিয়া জাতীয়তাবাদ তালাত পাশা প্রভৃতি তাঁর সাহচর্য্য করিয়াছিলেন শিক্ষা বিভাগে।

মাদাম হালিদা প্রভৃতি সংস্কারকামী স্বদেশ-সেবিকা ও দেশভক্তদের কত বিরাট অজ্ঞতা ও দুষ্টামীর সঙ্গে যুঝিতে হইয়াছিল, তাহার একটা গল্প বলিব তাঁহার জীবন-স্মৃতি অবলম্বন করিয়া। এ গল্প হইতে তখনকার তুর্কীসমাজের নিম্নস্তরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৪ সালে শিক্ষা সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মাদাম বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার ভার পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন ইস্তাম্বুলের এক ইতর পল্লীর ভিতর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে

অদ্ভুত শিশু

মাদাম প্রাচীন ঢিলা পোষাক ছাড়িয়াছিলেন—তাঁর পোষাক আঁটসাঁট। তিনি তুর্কী রমণীদের মত বেণী না বাঁধিয়া খৃষ্টান স্ত্রীলোকদের মত মাথার উপর এলোচুলের খোঁপা বাঁধিতেন। সারসাপের ভিতর ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীদের মত পোষাক ছিল—

সাদা কফ ও কলার। তিনি যখন এই পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলেন, পথে একদল বালিকা খেলিতেছিল। দারিদ্র্যের উচ্চাভিলাষ, অনুকরণ-প্রয়াস আর প্রচণ্ড অশিষ্টতা পীড়িত করিল মাদামকে। কতকগুলা নগ্নপদ—কতকগুলা বালিকার পায়ে কাঠের তুর্কী খড়ম। বুক ফুলিয়ে মেয়েগুলা ঘুরিতেছিল। একজনের কোলে ছিল একটি শিশু—গায়ে ধূলা, নাকে কফ ঝরিতেছিল। অপর একজনের হাতে একটা জীর্ণ রেশমী ছাতা —যেটি অতীতে ভাল দিন দেখিয়াছে কিন্তু আপাততঃ চোরাই মাল। তারা উচ্চবংশের মহিলাদেয় ভাবভঙ্গীর বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতে লাগিল মাদামকে দেখিয়া। মাদামের মনে আতঙ্ক হইল অপমানের—আর তিনি বিষণ্ন হইলেন দেশের সাধারণ শ্রেণীর মেয়েদের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা দেখিয়া।

ছত্রধারিণী বলিয়া উঠিল—ওঃ হোঃ ওরে চেয়ে দেখ, কে যাচ্ছে। এর মাথায় একটা হাঁড়ি। গামছা পরে আবার পথে বেরিয়েছে। ওমা! আবার গলায় আর হাতে পাতকুয়ার পাট।

এ রসিকতায় সবাই তাঁর মাথার চুল আর আঁটাসাঁট পোষাক প্রভৃতি দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মাদাম বুঝিলেন এবার এরা ইঁট ছুড়িবে। তিনি তাড়াতাড়ি মুখের আবরণ খুলিলেন—ভাবিলেন মানুষের মুখের একটা শক্তি আছে ধৃষ্টতা দমন করিবার—বিশেষ শিক্ষিত মহিলার চোখের। তিনি ছাতা হাতে মেয়েটিকে বলিলেন—বাঃ, বেশ ছাতা তো তোমার।

বালিকা একটু স্থির হইল। এতক্ষণ সে মাদামের চলনের অনুকরণ করিতেছিল। হালিদা আরও একটু মিষ্ট কথায় তাদের তুষ্ট করিল। কিন্তু যেমনি তিনি একটু চলিবার চেষ্টা করিলেন মেয়েগুলো ঢিল কুড়াইল। আবার দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন মাদাম। মিষ্ট কথা বলিলেন তাদের মনতুষ্টি বিধানের জন্য। তখন মাদামের গোড়ালী উঁচু জুতা দেখিয়া একজন বলিল—আঃ! হাঃ! বেশ তো উঁচু নাইবার ঘরের খড়ম পরেছ।

তখন তালে তালে সবাই সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিল—এর মাথয় হাঁড়ি আছে। এর মাথায় হাঁড়ি আছে।

ছাতা হাতে মেয়ে বলিল—থাম বেহায়া! তোর বোনও কালো সারসাফ পরে—মুখে পাউডার দেয়—গালে রং মাখে।

"বেশ করে। তার খুসি! তাকে মানায় তাই সে সাজে তোর কি রে বাঁদরমুখী?"

ছাতাওয়ালী ত' ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে বলিল—বাঁদরমুখী তুই। তোর বোন তো বেগুনমুখী! তার উপর যখন পাউডার মাখে—তখন কিবা মানায়!

—কেন মাখ্‌বে না। তার ভালবাসার পাত্র তাকে দেয়। তোর বোনের কি ভালবাসার মানুষ আছে? বল্‌না—জবাব না দিস্‌তো এই ইঁট মেরে তেকো ঘায়েল করব।

সে ভয় পাবার মেয়ে নয়। সে বল্‌লে—ইঁট মারবে। কোলে ঐ জারজ জিপসী ছেলে নিয়ে।

মাদাম এই হিড়িকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

তখন ছেলে কোলে মেয়েটি বলিল—লজ্জা করেনা অচেনার হ'য়ে পাড়ার মেয়ের সাথে ঝগড়া করতে।

তখন আবার সবার নজর পড়িল মাদামের উপর। তাঁকে আবার চাতুরীর আশ্রয় লইতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার দিদির ভাববাসার মানুষটি কে?

—কেন নোয়া ড্রাইভার। সে তাকে লাল সারসাফ দেয়, পাউডার দেয়। বলুক না—ওর দিদির কি উপপতি আছে?

এবার তারা নোয়াকে লইয়া কোঁদল করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাদাম মোড় ঘুরিয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। তখন তাহারা শিকাব হাতছাড়া হয় দেখিয়া সন্ধিস্থাপন করিয়া মাদামের দিকে দৃষ্টি দিল। ভাগ্যক্রমে এক কসাই আর এক চাটনীওয়ালা লাঠি লইয়া বালিকাগুলিকে তাড়া করিল। তারা রণে ভঙ্গ দিল। কসাই খুব বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়া মাদামকে ভদ্রপল্লীতে পৌঁছিয়া দিল।

এই গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেকালের ইস্তাম্বুলের কি অবস্থা ছিল। আর এই বিশ বৎসরের মধ্যে তুরস্ক কত উন্নতি করিয়াছে। প্রাচ্যে মানুষ বহু শতক কেবল হুকুম মানিয়া আসিয়াছে। সুলতান বাদসাহেরা শিক্ষা বা সৌষ্ঠব বিষয়ে সাধারণ প্রজাকে হুকুম দিত না। এখন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক, রেজা খাঁ ইরাণী প্রভৃতি হুকুম দিয়া স্বদেশকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। ইহারা মানুষের মেজাজ বুঝিয়া

নিজেদের শক্তি বুঝিয়া ঐ কার্য্য করিতেছেন—তাই তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে।

১৯১৩ সালে মাত্র কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তুরস্কে পুরুষের শিক্ষার জন্য। সেখানে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র উচ্চ-

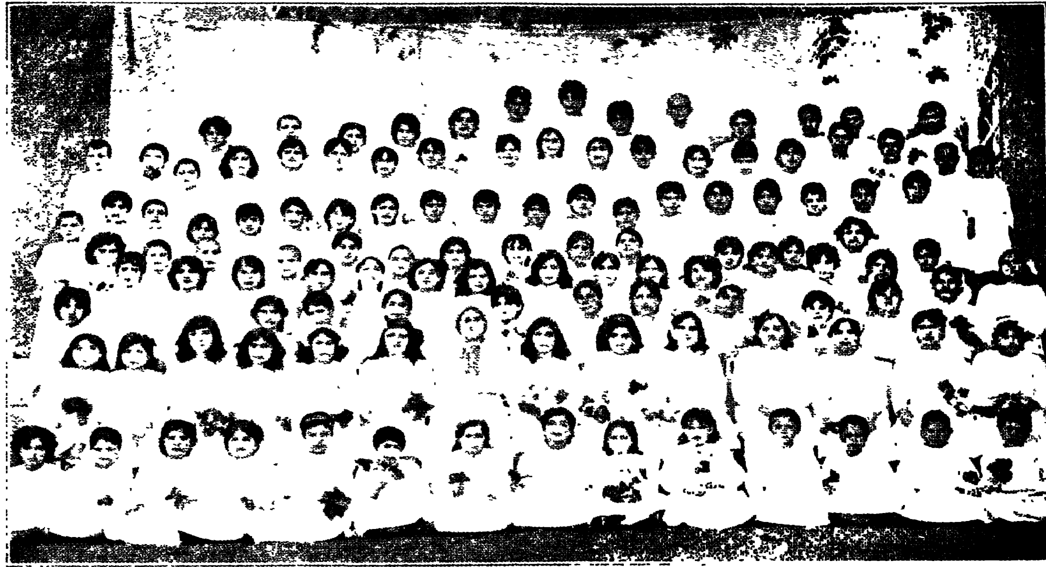
শিক্ষা

শিক্ষালাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইত। স্ত্রী-শিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না—কোরাণ মুখস্থ করা ব্যতীত। ১৯১৩ সালে নূতন শাসন-পরিষদ শিক্ষা বিস্তার করিতে কৃতসংকল্প হইল। সমস্ত দেশে অনেকগুলি কলেজ একত্র খোলা হইল। তালাত পাশা স্বয়ং তোষামদ করিয়া মাদাম হালিদাকে শিক্ষা পরিদর্শন করিতে সম্মত করিয়াছিলেন। মাদামের সহকর্ম্মী ছিলেন নাকী হান্নুম। এঁদের সমবেত চেষ্টায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আমেরিকান মিশনারী স্কুলে আরমানী ও গ্রীক বালিকাদের সাথে পড়িতে হইত মুসলমান মেয়েদের।

ধর্ম্ম শিক্ষা হইত মাদ্রাসায় ও মসজিদ-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে। শেখ-উল ইশলাম হায়রী এফেণ্ডী এদের কর্ত্তা ছিলেন। দেশের

মাদ্রাসা

মোল্লাদের বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া শেখ-উল-ইশলাম এই সব বিদ্যালয়ে নবীন সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। ছোট ছোট অনেকগুলা পাঠশালা একত্র



বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

করিয়া স্থানে স্থানে স্ত্রী-শিক্ষার ও বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল।

এই সব নূতন বিধানে তুর্কীরা নবীন আগ্রহের সঙ্গে সাড়া দিল। নবীন গ্রাজুয়েটেরা অধ্যাপনার কার্য্য করিতে লাগিল। দলে দলে ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আরমানী ছেলেমেয়েরা বেশ গান গাহিতে পারিত। মুসলমান খৃষ্টান একই বিদ্যালয়ে একই রকম শিক্ষা পাইতে লাগিল। এই সব কার্য্যে মাদাম প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশের সকলের মধ্যে সাড়া পড়িল।

দেশের সাড়া

কাজেই মুস্তাফা কামাল যে জমির উপর চাষ করিয়াছেন তাহাতে তাঁর পূর্ব্বকালে দেশভক্তেরা হাল চালাইয়া গিয়াছিলেন। বেচারা আমানুল্লা যাদের লইয়া নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা প্রস্তুত ছিল না মোটেই সংস্কারের জন্য। সুতরাং রক্ষণশীল মোল্লা মৌলবী আর স্বার্থান্ধ অর্থবান লোক যখন সাধারণ আফগানকে বুঝাইয়া দিল যে আমানুল্লা ধর্ম্ম ও সমাজের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া আফগানিস্থানকে জাহান্নমের পথে লইয়া যাইতেছে—আফগানের বুঝিবার শক্তি ছিল না আমানুল্লার বিপ্লবের অর্থ।

কামাল পাশা অতীতের পুরাতন রাস্তা ছাড়িয়া উল্টা পথে স্বজাতিকে বিপদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে কিনা, এ কথা বলা কঠিন। কিন্তু ঐ পথে চলিবার জন্য তুর্কী যে

বহুদিন অবধি আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার অনাগতকালের সুখদুঃখ নির্ভর করিবে সেই ব্যক্তি বা জনসঙ্ঘের উপর—যাহারা কামাল পাশার স্থলাভিষিক্ত হইবে। তাহারা যদি আবার একটা নবীন পথ আবিষ্কার করিবার লোভে এখনকার আদর্শের বিরোধী কোনো পথে স্বজাতিকে টানিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে গণ্ডগোল অনিবার্য্য।

মহাযুদ্ধের কালে এবং তার পরবর্ত্তী যুগেও শিক্ষার কার্য্য দৃঢ়তার সহিত চলিতে লাগিল। কেবল সাহিত্য-বিজ্ঞান ছাড়িয়া অর্থকরী বিদ্যাও শিক্ষা দিতে

মহাযুদ্ধের কালে

লাগিল তুরস্ক তার যুবকদের,—আঁতুরায় সূত্রধরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। তুর্কী জার্ম্মাণীর লোকদের অনেক শিক্ষাবিভাগে নিয়োগ করিয়াছিল। এখনও বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে তুরস্কের কোনো বাছ-বিচার নাই।

এখন ইউরোপ হইতে প্রায় তুর্কী চলিয়া আসিয়াছে। আরব, মেশোপোটেমিয়া, সাইরিয়া, ট্রান্সজরডান প্রভৃতি আর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে নাই।

আরবী বিরোধ

আরবের সহিত তাহাদের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কামাল পাশা নিজেকে গাজী বলেন না; কারণ গাজী শব্দ আরব্য। লোকে তাঁহাকে বলে আতা-তুর্ক। তুর্কী ভাষা হইতে আরবী কথা

উপড়াইয়া ফেলা হইতেছে। মাত্র আঙ্গোরা লইয়া এখন তুর্কী।

এদিকে আরবেরাও জাতীয়তাবাদী হইতেছে। কিন্তু সে জাতীয়তাবাদ আরবের বিভিন্ন স্বার্থকে একত্র করিয়া নূতন আরবজাতি গড়িয়া তুলিতে সহজে পারিবে না। সে কথা আমার এ প্রবন্ধে অবান্তর। হাঁসকোন লিখিত 'ইম্‌পিরিয়ালিজম ও ন্যাসানালিজিম ইন্ দি নিয়ারইষ্ট' এবং 'ন্যাসানালিজম ইন্ দি ইষ্ট' পুস্তক দুইখানি পাঠ করিলে। এ বিষয় বিষদ তথ্য বুঝা যায়।

মাদাম হালিদা এবিদের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষ করিয়া আমি এ প্রবন্ধ লিখিয়াছি—পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য।

উপসংহার

তাঁর স্ব-লিখিত জীবন-চরিত ও তাঁর দেশের ইতিহাসের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য।

কেবল আদর্শ স্বদেশ-প্রীতিতে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। নিজের দেশের লোককে উত্তমরূপে কর্ম্ম-জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে জাতি উন্নত হয় না—এ শিক্ষাও নবীন তুর্কীর ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। দলাদলিতে সিদ্ধ হয় ক্ষণিকের স্বার্থ—ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের। অতীতের লুপ্ত-গৌরব স্মরণ করিলে অনাগত কালের সম্পদ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রেরণা আসে। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে ব্যষ্টি ও

সমষ্টির অভিব্যক্তি হয়। অভিব্যক্তি-মূলক উন্নতি ধীর সাধনার ফল, তাই সে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। আবেগমূলক বিপ্লব ক্ষণিকের উত্তেজনা উদ্বুদ্ধ করে মাত্র—পরে আবার শৈথিল্য ও অবসাদ দ্বিগুণবেগে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিত্বের প্রসারের প্রধান সহায়ক যেমন সংযম, তেমনি সংযম প্রয়োজন জাতীয় উন্নতির পথে। অসংযত অশিষ্ট জাতি কোনদিন স্বাধীনতালাভ করিতে পারে না। লেনিনের অনুজ্ঞা জারের অনুজ্ঞার সমান দৃঢ়—তাদের আদর্শ ভিন্ন—মুখ মাত্র। কামালপাশা আব্দুল হামিদের মত দৃঢ়-সঙ্কল্প—তার আদর্শ জাতীয় উন্নতি—তার ব্যক্তিত্ব নিজেকে লুপ্ত করিয়াছে জন-হিতকল্পে। তুরস্কে রক্ষণশীল লোক নাই এমন কথা নয়। কিন্তু নবীন-তুর্কীর প্রভাব, তার গঠন-শক্তি ও উৎসাহ শিথিলদের শীঘ্রই নবীন করিবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

(ক)

গত ১৫ই ফাল্গুন ১৩৪১ সাল মাদাম হালিদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে তুরস্কে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক যে বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহার সার সংগ্রহ করা হইল।

ভারতবর্ষে আসিয়া বহু মনীষীর সহিত আলোচনা করিয়া মাদামের ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, সমস্ত প্রাচ্য ভুখণ্ডের সমস্যা এক। মহাপুরুষ আশুতোষের চিত্র তলে তাঁহার এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তুরস্কের আয়তন ও লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের আয়তন ও লোক-সংখ্যার অনুপাতে সামান্য হইলেও নবীন তুরস্কের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীর উপেক্ষার বিষয় নহে। তুর্কীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আরম্ভ হয়। মাত্র দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে শাসকদের মনে সাম্রাজ্যবাদ বর্ত্তমান না থাকিলেও প্রজা শোষণের বাসনা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে তুরস্ক বহু রাজত্বে পরিণত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেক রাজ্যই বিদেশী শক্তির প্রভাবের মধ্যে আসে। সেই সময় হইতে বিদেশীর মনেও দেশের শোষণনীতির পরিচয় পাওয়া যায়; এবং তুরস্কের শাসক সম্প্রদায় জনসাধারণের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে আপনারা সমৃদ্ধিশালী

হয়। শিক্ষা সার্ব্বজনীন ছিল না বলিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত দেশবাসী সাধারণ অজ্ঞ প্রজার হিত-কামনায় উদাসীন ছিলেন। শিক্ষা সার্ব্বজনীন না হইলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—নিরক্ষর জাতির পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিযানের গতিরোধ করা অসাধ্য। তাই সাধারণ শিক্ষা ও তুর্কী জাগরণের আদর্শ বহিয়া তরুণ দেশসেবী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতাও তাঁহারা একান্ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বহুদিন রাজশক্তির সহিত যুঝিয়া, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়া ১৯১৮ সালে তুরস্ক পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়াছে।

নবীন তুর্কী, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃত্তিমুলক শিক্ষা দ্বারা তুর্কী চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উদার-বৃত্তির সেবক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ শ্রমিক প্রভৃতির শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তুর্কীর জাতীয় পরিষদ মাদামের মতে প্রাচ্য ভুখণ্ডে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা। ইহা বিভিন্ন আদর্শের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ঐ সময় ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা করা হয়, এবং মাদ্রাসা সমূহ তুলিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে মাঝে মাঝে মোল্লারা উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া নবীন তন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পারিবারিক আইন পরিচালনের ভার শেষে উয়ালি-উল-ইস্‌লামের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। বহু গর্হিত প্রথার রহিত করা হয়, এবং স্ত্রীলোকদের অধিকার বাড়ান হয়। তালাক্ দিবার অধিকার মাত্র স্বামীর হাতে না রাখিয়া আদালতের হস্তে সমর্পণ করা হয়। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদের অধিকার পুরুষের অধিকারের অনুরূপ করা হয়।

নবীন তুর্কীতে কিন্তু মানুষ তাদের অধিকারের বিষয় অপেক্ষা কর্ত্তব্যের কথাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিয়া থাকে। আর্থিক অবস্থায় ও তুর্কী অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। মাদাম্ বলেন কেবল মহাপুরুষ ও মহিয়সী অধিবাসীর দ্বারা ভারত উন্নত হইবে না। জনসাধারণের জীবিকা উপার্জ্জনের অনুরূপ শিক্ষা না দিলে এবং তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিলে ভারতবর্ষে আদর্শ জাতি গঠিত হইতে পারে না।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সমানভাবে ভারতবর্ষকে ভাল না বাসিলে এবং তাহার দুঃখ-মোচনের জন্য সমবেত হইয়া এক জাতিয়তা সূত্রে আবদ্ধ না হইলে কোন মঙ্গল আশা করা যায় না।

(খ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতার সারাংশ।

প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও তাহাদের নিজেদের ভাবধারার সমন্বয়ে তুরস্ক জাতি গঠিত। পৃথিবী তুরস্কের যুদ্ধনীতি বিদিত, তাহার সভ্যতা সম্বন্ধে বেশী কথা জানে না।

পরিশিষ্ট

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন তুর্কী জাতি সম্বন্ধে অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায় যে প্রায় কুড়িশতক পূর্ব্বে তুরস্ক ও চীনের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বাধিয়াছে। এবং সে সংগ্রামে তুরস্ক নিজের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। চীনা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এবং চীনদেশে বসবাস করিয়া চীনের প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আস্থাবান মঙ্গল জাতি অলস হইতে লাগিল। মহান ভারতের মত আধ্যাত্মিক জ্ঞান তুর্কী জাতির ছিল না। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির মত তাহারা ঘোর বাস্তব-বাদীও ছিল না। তাহারা মুসলমান হইবার পর ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহিত্যের আবহাওয়াও সামরিক ভাব গ্রহণ করিল। আলবারুনি আর্ব্বি ভাষায় হিন্দু- দর্শন অনুদিত করিয়াছিল, সেই ভাবধারা তুর্কীর সাহিত্যকে রঞ্জিত করিয়াছিল।

তুর্কীর সাহিত্য যাহারা রচনা করিত রাজ-শক্তির মনোনয়ন করিতে না পারিলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতে হইত। জাতীয়তাবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পর তুর্কী সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ মত এবং জাতীয়তা-বিরোধী ভাবসমূহ বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

উপসংহারে তিনি বলেন—"আমি ভারতকে নমস্কার করি, বাংলাকে নহে, উত্তর ভারতকে নহে, দক্ষিণ ভারতকে নহে, এই ভারত বা অপর কোন ভারতকে নহে, কিন্তু বিভিন্ন

সভ্যতার সমন্বয়ে যে বিশাল ভারত গঠিত হইবে, সেই ভারতকে আমি নমস্কার করি, আমি মিলিত ভারতকে নমস্কার করি।"

(গ)

১৯শে ফেব্রুয়ারী, লক্ষ্ণৌ স্বদেশী লিগের উদ্যোগে যে সভা হয় তাহাতে মাদাম হালিদা এদিব অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা দেন—

সমাজের হিতসাধন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদ প্রকৃষ্ট নীতি ও গৌরবের নিরপত্তা। নবীন তুর্কী প্রজা সাধারণের হিত-সাধনে উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। মিদ্দত পাশা তুর্কীর গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালে উৎপীড়নের অবধি ছিল না। তিনি তুর্কীর সেনাদল ও নৌ-বিভাগ ধ্বংস করিয়া অতি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন। তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহা সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে এনভার পাশা সেনাদল পুনর্গঠিত করেন। সেইকালে শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কৃত হয় এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মহিলার জন্য উন্মুক্ত হয়। ইউরোপ এই স্পৃহার সঙ্কেত বুঝিতে পারে না।

প্যান্-ইসলাম বা সমগ্র মুসলমান ধর্ম্মীকে এক রাষ্ট্রে শাসিত করার চিন্তা প্রথমে সংস্কার কামী তুর্কী দেশ-সেবকের প্রাণে জাগে। কিন্তু অচিরে তাহারা বুঝিয়াছিল সে ধারণার অযৌক্তিকতা। তাই পরে জাতিয়তাবাদ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

তিনি আশা করেন এই আদর্শ তুর্কীকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে।

(ঘ)

বোম্বাই সহরে বক্তৃতার সারাংশ

ভারতের হিন্দু-মুস্লেম সমস্যা সম্বন্ধে মাদাম বলেন যে সে সমস্যার সমাধান ভারতবাসীকেই করিতে হইবে। তাঁহাকে একজন মুসলমান লিখিয়াছিলেন যে মুসলমানের কৃষ্টি ও সভ্যতা ভারতের কৃষ্টির সহিত মিশাইয়া দিলে ভারতের মুসলমানেরা অমুসলমান হইয়া যাইবে কি না। উত্তরে মাদাম বলেন যে ঐ প্রকারের মনোভাব তাঁহাকে অতিমাত্র ক্লিষ্ট করে। তাহার উত্তরে তিনি সহস্রবার বলেন না-না-না। ইসলাম ধর্ম্ম আদৌ সাম্প্রদায়িক নয়। অপর কৃষ্টি ও সভ্যতার সংঘাতে তাহার মূল নীতি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মাদাম বলেন, অস্পৃশ্যতার জন্য ভারত জগতের চক্ষে হীন। এই পাপ ভারতের সামাজিক জীবন হইতে যতদিন না দূর হয় ভারতের ভাগ্যাকাশ তমসাচ্ছন্ন থাকিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মার অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

পল্লী অঞ্চল উন্নয়ন ও পল্লী-সংগঠনের আবশ্যকতায় মাদাম জোর দেন।

ভারতের স্বাধীনতা ও সংগঠনের দ্বন্দ্বে নারীর অধিকার না মানিয়া লইলে ভারতে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত এ মন্তব্য মাদাম প্রকাশ করেন।
